দ্বিজেন শর্মা

আমার একাত্তর ও অন্যান্য



আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের মহত্তম অধ্যায়, সাহস ঐক্য ও ত্যাগের এক অত্যুজ্জ্বল ইতিবৃত্ত। এই সংগ্রাম একটি জনযুদ্ধ বিধায় তাতে সম্পৃক্ত হয়েছেন সকল স্তরের মানুষ, আবির্ভূত হয়েছেন নতুন আদলে যা শান্তির সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই একাত্তর আমাদের আত্মপরিচয়ের এক নতুন দলিল যার অনন্যতা শতবর্ষেও ম্লান হবার নয়। এ নিয়ে অবিরাম সৃষ্টি হতে থাকবে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র। মুক্তিযুদ্ধে উচ্ছ্রিত প্রাণশক্তি বাঙালিকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল। এই বইয়ের 'আমার একাত্তর' অধ্যায়ে এমন আশাবাদই ব্যক্ত হয়েছে বারবার।

বইয়ের 'অন্যান্য' অধ্যায়ে আছে পাঁচমিশেলি লেখা, কিছু গ্রন্থ-আলোচনা ও স্মৃতিকথা। বিষয়বস্তুর ভিন্নতা সত্ত্বেও লেখাগুলির মূল সুর—ভালোবাসা, যা সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন, তার বেঁচে থাকার অবলম্বনও। অন্যান্য কিছু সুরও আছে—বস্তুনিষ্ঠতা, প্রগতিশীলতা, আধুনিকতা। সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক সার্থক সংশ্লেষ।

প্রকাশনার তিন দশক

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
২৪ শ্রীশ দাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
১৩০.০০ টাকা

ISBN 984-70152-0001-5

AMAR EKATTAR O ANNANYA by Dwijen Sarma
Published by Milan Nath. Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar Dhaka-1100

Price Tk. 130.00 US$ 5.00 Only

‘নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, এলে সকল-মাঝে —
তোমায় আমি হারাই যদি তুমি হারাও না যে ॥’

— রবীন্দ্রনাথ

অনন্তে অবলীন প্রিয়সখা
মীজানুর রহমান ও ওয়াহিদুল হক
স্মরণে, যাঁরা সোনার বাংলা নির্মাণের
স্বপ্নে আমৃত্যু আবিষ্ট ছিলেন।

ভূমিকার পরিবর্তে

একাত্তরের ২৫ মার্চ আমি ৪৪ সিদ্ধেশ্বরী রোডের খোন্দকার মঞ্জিলে ছিলাম। আমি এই বাড়ির অনেকদিনের ভাড়াটে, কর্মস্থল নটের ডেম কলেজ। সেই রাত্রের ঘটনাবলির বাস্তবাবস্থা আঁচ করতে পারি নি, ভেবেছি পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর দুটি দল, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সমর্থকদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আপন দেশবাসীর ওপর এমন আক্রমণ কল্পনাতীত ছিল। শেষরাতে সাত-আটজন নিরস্ত্র পুলিশ রাজারবাগ পুলিশফাঁড়ি থেকে পালিয়ে আমাদের বাড়ি এলে ব্যাপারটা প্রথম বোধগম্য হয়। গৃহকর্তা, আবু আমমেদ খোন্দকার একটি খালি ফ্লাটে তাদের আশ্রয় দেন। পরদিন সকালে আর তাদের দেখিনি, সম্ভবত শেষরাতে পালান। খোন্দকার সাহেব ছিলেন দক্ষ ক্রীড়াসংগঠক আমাদের নিয়ে ফুটবল, ভলিবল, বেডমিন্টন খেলতেন। আওয়ামিলীগের এই নেতা, একাত্তরে স্থানীয় যুবকদের রাইফেল ট্রেনিং দিয়েছিলেন এবং একদল মুক্তিযোদ্ধা গড়ে তুলেছিলেন। ২৭ মার্চ কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ উঠলে আমরা বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরই। বিগত দু'দিনের ধ্বংসের কিছুটা সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করি, আর সন্ধ্যার মধ্যে জেনে যাই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যত্র গণহত্যার খবর। ২৭ মার্চ শোনি স্বাধীনতার ঘোষণা, ২৯ মার্চ খোন্দাকর সাহেব বাড়ি ছেড়ে পালাতে বলেন। বাড়িতে তখন আমি আর কাজের ছেলে পল রোজারিও। পরিবারবর্গকে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই বরিশালে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়িওয়ালাকে গতমাসের ভাড়ার একটি চেক দিতে গেলে তিনি সেটা আমার পকেটে গুঁজে দেন। জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদেন, জানান সহকর্মী ও বন্ধুদের হত্যার ঘটনা এবং আশ্বস্ত করেন সবকিছু দেখে রাখবেন, দেরিতে ফিরলেও বাসা আমারই থাকবে। কিন্তু যাই কোথায়? প্রথমে বরিশালের কথা মনে আসে। পলকে নিয়ে রিক্সায় ওঠি, কিন্তু শান্তিনগরের চৌমাথা পাড়ি দিতেই স্থানীয় ছেলেরা আমাকে থামায়, সদরঘাট যেতে নিষেধ করে। ওদিকে নাকি পাকিস্তানি সৈন্যরা হামলা চালাচ্ছে পল তখন পূবাইল রেলস্টেশনের লাগোয়া তাদের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে, আমি রাজি হই এবং আমরা রিক্সা ফিরিয়ে মালিবাগের পথ ধরি ও একসময় শহর পেরিয়ে মাঠে নামি। সন্ত্রস্ত জনস্রোত চলছে অনির্দিষ্ট গন্তব্যে, তাদের সাহায্যের জন্য পথের ধারে স্বেচ্ছাসেবীরা দাঁড়িয়ে আছেন খাবার ও পানি নিয়ে। জিজ্ঞেস করছেন শহরের অবস্থা। প্রায় বিশ মাইল হেঁটে সন্ধ্যায় পলদের বাড়ি পৌঁছই। গোটা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ে ঢাকার খবর জানতে। আমরা অসম্ভব ক্লান্ত, পল কথা বলতেও পারছিল না। আমি যথাসম্ভব সবই জানাই। পলের বাবা আমার থাকার ব্যবস্থা করেন পাশের টমাস সাহেবের বাড়িতে। এখানে ছিলাম জুলাই পর্যন্ত, কখনও স্থানবদল করেছি, থেকেছি নাগরীতে নটেরডেম কলেজের গ্রন্থাগারিক হেনেসি পিউরিফিকেশনের বাড়িতে। আমার কোনই অসুবিধা হয় নি কোনদিন। এই এলাকার অনেকেই আমার প্রাক্তন ছাত্র আর গির্জাগুলোতে

ছিল নটের ডেম কলেজের ফাদারদের নিয়মিত যাতায়াত। যা কিছু দেখেছি, জীবনের যত রহস্য জেনেছি তার এক ভগনাংশও আমার লেখায় উঠে আসেনি। বন্ধু হাসান আজিজুল হকের কথা মনে পড়েছে, সঙ্গে থাকলে একসময় 'প্রশান্ত দন' জাতীয় একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখতে পারতেন।

একাত্তর বিষয়ক অধিকাংশ লেখাই সেইসময়ে নাগরী থাকার ইতিবৃত্ত। লেখাগুলো প্রথমে বেরয় 'সংবাদ' দৈনিকে, তারপর গ্রন্থভুক্ত হয়েছিল মুক্তধারা প্রকাশিত 'স্বদেশে প্রবাসে' বইয়ে, কিন্তু কয়েক কপি বাজারে আসার পর অবশিষ্ট সবগুলোই খোয়া যায় বাঁধাইকরের আস্তানা থেকে। পরে এ বিষয়ে আর বেশিকিছু লিখিনি। এই অনীহার মূলে ছিল এক ধরনের গ্লানিবোধ। ধর্ষিতা মাতৃভূমির পুণ্যস্নানের জন্য প্রয়োজনীয় রক্তদানের বদলে লেখালেখিকে বড়ই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছে, নিজেকে অপরাধী সাব্যস্তও করেছি, কেন না কৈশোরে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। এখন বয়স হয়েছে, সেই উন্মাদনা হ্রাস পেয়েছে, নতুন বিবেচনার উদয় ঘটেছে, ভাবছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ বিধায় আমার লেখায় তখনকার সাধারণ মানুষের যেসব কথা আছে সেগুলো হয়ত এই ঘটনার ব্যাপ্তি বোঝার জন্য নতুন প্রজন্মের সহায়ক হতে পারে। অধিকন্তু অনুপম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী স্নেহভাজন মিলন নাথের অবিরাম তাগিদও অনুঘটকের কাজ করেছে, তাই লেখাগুলো আবার আমার নতুন বইতে সংকলিত হলো। লক্ষণীয়, একাত্তর আমাদের জীবনে এতটাই নিবিড়তায় সম্পৃক্ত যে প্রসঙ্গান্তরেও তা বারবার উঠে আসে, কোনক্রমেই এড়ান যায় না, যাবেও না আমৃত্যু।

একাত্তরের জুলাই মাসের শেষে আমি ভারতে চলে যাই। কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ শিক্ষকসমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকি, বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে কাজ করি এবং ডিসেম্বরের শেষে দেশে ফিরি। ১৯৭৪ সালে আমি মস্কোর 'প্রগতি প্রকাশন' অনুবাদ সংস্থায় যোগ দিই এবং সেখানে বসেই পত্রিকার জন্য অধিকাংশ লেখালেখি। এগুলো আসলে প্রবাসীর স্মৃতিকাতরতারই এক ধরনের ফলশ্রুতি। ১৯৯১ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটলে এবং ১৯৯২ সালে 'প্রগতি প্রকাশন' অনুবাদকর্ম বন্ধ করে দিলে দেশে ফেরা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৯৫ সালে আবার আমি সপরিবারে ঢাকায় স্থায়ী বসবাস শুরু করি। দু'একটি ছাড়া বাকি সবগুলো বই-ই পরবর্তীকালের সংকলন বা রচনা। কিন্তু দীর্ঘপ্রবাসের পর দেশে ফিরলেও মন কোথাও থিতু হতে চায় না, এক ধরনের অস্থিরতা নিরন্তর তাড়া করে। এ হল সকল প্রবাসীরই এক অন্তর্গত দুর্গতি, অনেকটা এই রবীন্দ্রগানের ভাষ্যের মতোই :

"কে বলে 'যাও যাও'— আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।
টুটবে আগল বারে বারে তোমার দ্বারে,
লাগবে আমায় ফিরে ফিরে   ফিরে-আসার হাওয়া ।।
ভাসাও আমায় ভাঁটার টানে অকূল-পানে
আবার জোয়ার-জলে তীরের তলে ফিরে তরী বাওয়া ।।

পথিক আমি, পথেই বাসা —
আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা।
ভোরের আলোয় আমার তারা
হোক-না হারা,
আবার জ্বলবে সাঁজে আঁধার-মাঝে তারি নীরব চাওয়া ।।

তবু জীবন জীবনই, কাজকর্মের কথা ভাবি, লেখালেখিতে মন বসাতে চাই, শিক্ষকতায় ফেরার ভাবনাও মনে আসে। এক সময় এশিয়াটিক সোসাইটির 'বাংলাপিড়িয়া' প্রকল্পে জীববিদ্যা বিভাগে অনুবাদক-সম্পাদকের কাজটি জুটে যায় এবং তিন বছর সেখানে কাটে। এমন চমৎকার পরিবেশে বহুদিন কাজ করি নি। মস্কোয়ও কাজের পরিবেশ ছিল আদর্শ, কিন্তু অনুবাদের বিষয়বস্তুর অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান-বহির্ভূত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিষয়, তাতে আনন্দ পেতাম না। এবার কাজের সুযোগ পেলাম আপন বিষয়ে। তাছাড়া পরিবেশটি ছিল সম্পূর্ণ একাডেমিক, সকলেই ছিলেন সহমর্মী বন্ধুসম। তিনতিনটি বছর কেটে যায় খুব দ্রুত। বেরয় দশখণ্ডের বাঙালির জাতীয় জ্ঞানকোষ —'বাংলাপিড়িয়া', বাজারে যাওয়ার আগেই বিক্রি হয়ে যায় প্রথম সংস্করণের সব কপি।

তারপর অদ্যাবধি আর নিয়মিত কোন কাজ নেই, তবু সময় কাটে ব্যস্ততার মধ্যে। পত্রিকার জন্য লেখালেখি ছাড়াও আছে সভাসমিতি, উদ্যান বিষয়ক কনসালটেন্সি, পরিবেশ সংরক্ষণে শরিকানা, সুদর্শন বনবৃক্ষ সন্ধান, তরুণ প্রজন্মের নানা প্রকল্পে সহায়তা, ইত্যাদি। রাসেল কার্সনসহ পাঁচজন পরিবেশবিদের জীবনী নিয়ে একটি বই লেখার বাসনা অনেকদিনের। ডিএনএ আবিষ্কারের অন্যতম পথিকৃৎ অকালপ্রয়াত রোজালিন ফ্রাংলিন, মার্কসবাদী বিজ্ঞানী জে ডি বার্নাল ও জে বি এস হালডেন এই ত্রয়ীর জীবনী লেখার পরিকল্পনাও আছে। বইপত্র সবই জোগাড় হয়েছে, কাজ এগুচ্ছে না সময়াভাবে।

১ ডিসেম্বর, ২০০৭
ক্রিস্টাল গার্ডেন
৪ সিদ্ধেশ্বরী রোড (খোন্দকার গলি),
ঢাকা।

দ্বিজেন শর্মা

সূচিপত্র

আমার একাত্তর

অন্যান্য



নামহীন টমাসেরা

বহুদিন টমাস সাহেবের কোনো চিঠি পাই নি। বড়দিন আর ইস্টারে আমার পাঠানো কার্ডগুলোর প্রাপ্তিসংবাদও নয়। জুতসই কিছু কারণ কল্পনা করেই এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম। টমাস বিত্তবান নন। সামান্য ক'বিঘা জমি তাঁর। এতেই কায়ক্লেশে দিন চলে। আমাকে চিঠি লেখার ডাকখরচা তো কম নয়, ইত্যাদি। কিন্তু দেখলাম এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যি নয়। আসলে টমাস মারা গেছে আর এটাই আমি ভাবতে পারি নি। মারা যাবার মতো বয়সী তিনি ছিলেন না। শুকনো, একহারা চেহারার রোদেপোড়া শ্রমিক মানুষ। তাঁর পক্ষে কোনো মেদপৃক্ত উচ্চবিত্তের হৃৎবৈকল্যের হঠাৎ শিকার হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাঁর মৃত্যু ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে।

খবরটি ইদানিং জেনেছি। তাঁরই এক প্রতিবেশী লিখেছেন 'হায় বেচারি! আপনি তো ওনার ভাই ও ভাইয়ের বাড়ি চিনতেন। এক রাত্রিতে একদল ডাকাত ওনার ভাইয়ের বাড়িতে হানা দেয়। ওনারা ভয়ে পাটাতনের উপরে উঠেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য। ডাকাতরা পাটাতনের দরজা খুলতে বলার পর দরজা না খোলায় গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে টমাস সাহেবের ভাই পিটার সাহেব মারা যান। তিনিই তো পাটাতনের দরজা চেপে ধরেছিলেন। এদিকে সংবাদটি যখন টমাস সাহেবের বাড়িতে পৌঁছল, সাথে সাথে তিনি জ্ঞান হারালেন। সেই জ্ঞান আর কোনোদিন ফিরে পেলেন না। সে তো প্রায় দুই বছর আগের কথা। আপনি তো জানেন, পাকবাহিনী ওনার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। হাড়িখলা যাবার পথে ট্রেন থেকে সেই বাড়িটি দেখি। ঘরে চাল নেই, শুধু পোড়া দেয়ালগুলো পড়ে আছে। মনে হয় সেই বাড়িতে এখন আর কোনো লোক বাস করে না। সেই বাড়ির এক কামরায় এক সময় আপনিও ছিলেন আর আজ কী অবস্থা!'

একদা ওই বাড়িতে আমি ছিলাম, ছিলেন আরও অনেকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার পর টঙ্গীর অদূরস্থ মিশন-অধ্যুষিত নাগরী অঞ্চলে বহু লোক আশ্রয় নিয়েছিল। নাগরী বাজার তখন লোকে লোকারণ্য। স্কুল, ছাত্রাবাস, দোকানপাট কোথায়ও তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। এখানকার প্রতিটি মানুষ এগিয়ে এসেছিল শরণার্থীদের সাহায্যে। প্রতিটি গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল দুর্গত মানুষের জন্য। এমন একটিও বাড়ি দেখি নি যেখানে কোনো-না-কোনো শরণার্থী আশ্রয় পায় নি। চরম বিপদের সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে নাগরীর মানুষ

সেদিন এই সেবাকর্মে ব্রতী হয়েছিল। এমনটি আর জীবনে কোনোদিন দেখব না। জাতীয়তাবাদী আবেগের এমন আশ্চর্য উচ্ছ্বয়ের মহিমান্বিত বর্ণাঢ্যতা জাতির জীবনে বারবার পুনরাবৃত্ত হয় না।

আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম নাগরীলগ্ন দাড়িপাড়া গ্রামে। পাশেই রেললাইন, কিন্তু সেটা তুলে ফেলা হয়েছিল। জেলাবোর্ডের একটি অসম্পূর্ণ সড়কও ছিল। কিন্তু পথের সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে কাউকে উদ্বিগ্ন হতে দেখি নি। গ্রামবাংলা তখন স্বাধীন আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে আমরাও তখন তরুণ হয়ে উঠেছিলাম।

ঢাকা থেকে বেরিয়ে জনস্রোতে ভেসে ভেসে চলার পথে কুঁড়েঘর কিংবা খড়গাদার বেশি কোনো আশ্রয় প্রত্যাশা করি নি। শেষে টমাস সাহেব সহাস্য মুখে ডেকে নিলেন তাঁর বাড়িতে। দু'কামরার পাকা ঘর, খোলা বারান্দা, চমৎকার রান্নাঘর, বাথরুম। গ্রামের পক্ষে একটু অপ্রত্যাশিতই। ঘরে আসবাবেরও অভাব ছিল না ভাল খাট, সোফা, ইজিচেয়ার, আলমারি, পোশাকী, ড্রেসিং-টেবিল। টমাস রেলের অবসরভোগী ড্রাইভার। সঞ্চিত সবটুকু অর্থ দিয়েই এসব আয়োজন করেছিলেন। আশা ছিল, নিজ গ্রামে অবসর জীবনটা শান্তিতে কাটাবেন। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির মতো নির্মম যে-ইতিহাস তারই আলোড়নে টমাসের সুখনীড় ভেঙে গেল। জানি না, রাজনীতির জগতে যারা তাঁর মতো নামহীন, ইতিহাস কিভাবে তাদের পুনর্বাসিত করে। আজ কত কথাই মনে পড়ছে। যখন এসেছিলাম তখন চৈতালী জ্যোৎস্নায় কী নিবিড় শান্তিতেই না আচ্ছন্ন ছিল গ্রামটি। ইস্টারের আয়োজন চলছিল। চালের গুঁড়ি-কোটার শব্দ আর উৎসব-সঙ্গীত মুখরিত ছিল ঘরে ঘরে। আর যখন গ্রামটি ছেড়ে যাবার সময় এল তখন বিপদের বৃত্তটি কেন্দ্রাভিসারী সঙ্কোচনে নাগরীর নিকটবর্তী হয়েছে। ততদিনে সকলের মুখ থেকে হাসি উবে গেছে, আশা বিবাগী হয়েছে। আসন্ন মিলিটারি হামলার নিদ্রাহর দুর্ভাবনা ঘরে ঘরে।

যেদিন চলে যাই, সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে। আমার প্রথম দেখা শেষ বসন্তের ফসলসবুজ মাঠটি তখন অথৈ জলে ডুবে গেছে। ধানের মাথা কায়ক্লেশে জলের ওপর ভেসে ছিল। টমাস সাহেবের বাড়ির চারিদিকে মাথাসমান পাটখেত। ছড়ান বাড়িগুলো যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সকলের বিষণ্ন মুখ। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকায় উঠেছিলাম। আকাশে গোধূলির আশ্চার্য রঙ ছিল। আর সবাই জানিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলায় আবার দেখা হওয়ার শুভকামনা।

স্বাধীন বাংলায় আবার দড়িপাড়ায় ফিরে এসেছিলাম। গ্রামটি তখন পুড়ে গেছে। টমাসের সংসার ছত্রখান। তিনি নিঃস্বপ্রায়। তবু তাঁকে ততটা নিরাশ মনে হয় নি। সোনার বাংলার ঘরে ঘরে আবার শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এমন একটা নিশ্চিত ধারণা তখনও তিনি মনে মনে ধরে রেখেছিলেন। হয়ত-বা ভেবেছিলেন চাকরিতে আবার তাঁর ডাক পড়বে, আবার ট্রেন চালাবেন আর তখন বাড়ি, পুড়ে যাওয়া আসবাবপত্র এসব নিয়ে খুব একটা অসুবিধা হবে না। বলা বাহুল্য, টমাস সাহেবের এসব আশা পূর্ণ হয় নি।

টমাসকে আর কোনোদিন দেখব না। অথচ কতবার ভেবেছি দেশে ফিরেই এক ইস্টার উৎসবে আবার দড়িপাড়া যাব। পূবাইল স্টেশন থেকে একটু দূরেই বড় পুল। তার

পরই দূরে টমাস সাহেবের বাড়িটি দেখা যায়। কলাগাছের ঝোপ আর খেজুর গাছে ঢাকা একটি টিনের ঘর। রেললাইন থেকে নামলেই মৌসুমী ফসলের শ্যামলী মাঠ। ভেবেছি, হয়ত তাঁকে মাঠেই খুঁজে পাব কিংবা তাঁর বাড়িতে। আবার বসব সেই উঠনে, পুষ্পিত বেলিঝাড়ের পাশে, দেখব কলাপাতায় জমে-ওঠা ভোরের শিশিরে টুনটুনির নাওয়া কিংবা দুপুরের উজ্জ্বল রোদে উড়ন্ত হলদে পাখি আর পাপিয়ার ঝাঁক, আলাপ হবে পাশের বাড়ির সেই মেয়েটির সঙ্গে, কোনো দুর্বল মুহূর্তে যে আমার একটি হতাশ মন্তব্য শুনে চিৎকার করে উঠেছিল, 'ওমা, স্যারে কয় কী, জয়বাংলা নাকি অইব না!' আর সেই মুহূর্তে কী আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটেছিল! কারা যেন ছুটে আসছিল এবং তাদের নিঃশব্দ ভর্ৎসনার মুখোমুখি আমি মৃত্যু কামনা করেছিলাম। ভেবেছি সেই 'সংগ্রামের দিনের' মতো আবার টমাস সাহেবের সঙ্গে গুড়ের চা আর মুড়ি খাব, এঁদো পুকুরে মাছ ধরব, বসব জমির আলে, যেখানে খেটে খেটে টমাস নিত্যদিন ঘর্মাক্ত হন এবং এক রবিবারে যাব নাগরীর গীর্জায় যেখানে টমাস 'নামাজ' পড়েন। সেদিন ওখানে বর্ণাঢ্য নরনারীর ভিড় জমে। দেখা হবে অনেকের সঙ্গে যাঁরা একদা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, ভালবেসেছিলেন।

কিন্তু আজ এই মধুর কল্পনার অবকাশটুকুও ঘুচেছে। এখন ভাবছি দেশে ফিরে সেই দগ্ধ-গৃহ, শূন্য-ভিটেয় কী মুখে দাঁড়াব টমাসগিন্নির সামনে! কী বলব তাঁকে? ইতিহাস, ভবিতব্য? কী সান্ত্বনা নিহিত এতে? অথচ সংগ্রামের সেইসব দিনে কত কথাই তো বলেছিলাম। টমাস সাহেবের কাহিনী এখানে শেষ। এই স্মৃতিকথা তাঁর জন্যে নয়। এটি আমাদের জন্য। মুক্তিযুদ্ধ ও সম্প্রসারিত অভিঘাতে যেসব নামহীন মানুষ সুখের বদলে বেদনার, জীবনের বদলে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন, টমাস তাদেরই একজন। এই মৃত্যু কাঙ্ক্ষিত নয়। যে-দীর্ঘ ও জটিল শৃঙ্খলে আমাদের সুখ বিধৃত এমন মৃত্যুতে তা ভেঙে পড়ে, খণ্ডছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়। টমাসের এই মৃত্যুতে আমাদের সমবেত সুখের ভাণ্ডারটি আরও ঊনো হল।



কদম আলিকে খুঁজি নি

একাত্তরের আগস্টের ঘটনা। দশাসই চেহারা দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও শেষে গৃহস্বামীর ভরসায়ই কদম আলির নৌকায় উঠেছিলাম। জায়গাটা ছিল সীমান্তের কাছেই। গুলিগোলার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলাম। মাথাপিছু দশ টাকার চুক্তিতে নিরাপদ সীমান্ত-পাড়ি আর যথাসম্ভব আরাম-আয়েসের আশ্বাস দিয়েছিল কদম আলি।

অবশ্য এসব আশ্বাসের ওপর আমি ততটা ভরসা করি নি। দেখলাম ওর নৌকা নানা ঘাটে ভিড়ছে, লোকজন তুলছে। শিশু নারী বৃদ্ধ এবং তাদের লটবহরের চাপে আমাদের তখন নাভিশ্বাস। একজনের মৃদু প্রতিবাদ শুনলাম ওর ধমকানিতে চাপা পড়ে গেল। তারপর আর কিছুই অস্পষ্ট ছিল না। মাঝরাতে নৌকা থামিয়ে রাজাকারদের মনবদলের কী একটা অজুহাত শুনিয়ে সে টাকার একটা বাড়তি অঙ্ক দাবি করেছিল এবং কারও মতামতের তোয়াক্কা না করে আমাদের সামনে তার দুর্বিনীত হাতটি মেলে ধরেছিল। একের পর এক হাতটি সরে সরে এসে হঠাৎ আমার সামনে থেমে গিয়েছিল। শুনলাম ও বলছে : 'আপনে কী করেন?' পরিচয় লুকানোর মতো অবস্থা ছিল না। জবাব শুনে আমার ছেঁড়া শার্ট আর ময়লা লুঙ্গির ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে যেন স্বগতোক্তির মতো বলল 'তা অইলে আপনি একজন প্রফেসার?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে তার হাতটি সরিয়ে নিয়েছিল এবং পথে বৃষ্টি এলে নিজের ছাতাটি আমার উপর মেলে ধরে আমাকে অবাক করে দিয়েছিল।

ভোরে বিলের মাঝখানে এক টিপির মতো জায়গায় সে নৌকা ভিড়িয়েছিল। দু'তিনটে ঘর, ক'টি হিজল গাছ এবং কিছু আগাছার এই শ্রীহীন সমাহারে কিন্তু নিরাপত্তার আশ্বাস লুকানো ছিল। সে যে-ঘরে আমাদের এনে তুলেছিল সেটি ছিল একহাঁটু কাদা আর নোংরা জঞ্জালের এক আঁস্তাকুড় এবং সেখানেই আমরা বিছানা পেতেছিলাম।

উঠনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে কচুরিপানার ঠাসবুনুনির শোভা দেখার সময় শুনলাম কদম আলি আমাকে ডাকছে : 'আমার ঘরে একটু আসেন না স্যার!'

আমাকে বারান্দায় বসিয়ে ঘরের অন্ধকারে সে মিলিয়ে গিয়েছিল। কানে এল চা তৈরির টুংটাং আর সুপারি কাটার আওয়াজ। শুনলাম কদম আলি বলছে 'আমাগো প্রফেসারগো মিলিটারিতে মাইরা ফালাইতাছে।'

তারপর যা ঘটেছিল তা একেবারে অভাবিত। কদম আলি বেরিয়ে এল হাতে চায়ের গ্লাস আর পানের বাঁটা নিয়ে, পেছনে ঘোমটা-পরা বৌ, কোলে এক শিশু।

কদম আলি চা আর পানের বাটা আমার সামনে রেখে বলেছিলে 'ছাইলাটারে দোয়া করইন স্যার, ওর যেন একটু লেখাপড়া হয়।'

সেদিন রাতেই আমরা নিরাপদে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিলাম। প্রবাসে কেবলই কদম আলির কথা মনে পড়ত। ভাবতাম স্বাধীন দেশে ফিরে প্রথমেই কদম আলির সঙ্গে দেখা করব, এমন কি ওর গাঁয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করার মতো অসম্ভব খেয়ালিপনাকেও মাঝে মাঝে প্রশ্রয় দিতে কসুর করি নি। ভেবেছি কতই-বা আর দূর। ঢাকার কাছের পূবাইল স্টেশন থেকে নাগরীর হেনেসিদের বাড়ি, তারপর ঢাকা-নরসিংদী সড়কের কালভার্ট পেরিয়ে এক দিনের পথ মেঘনাপাড়ের মাধবদি বন্দর, সেখান থেকে একরাত গেলেই কদম আলির গাঁ। 'সংগ্রামের' সময় একদিন একরাত লেগেছিল, শান্তির সময় নিশ্চয়ই আরও কম লাগবে।

তারপর সংগ্রাম শেষ হল, আমরা স্বাধীন দেশে ফিরলাম এবং কদম আলির স্মৃতিও ক্রমেই ঝাপসা হতে লাগল। এখন, এই এক দশকের পর মনে হয় কদম আলির গাঁয়ের দূরত্ব বেড়েছে যেন জ্যামিতিক হারে, যেন একদিন একরাতের পথ এখন যোজন যোজন দূরে, যেন ওখানে আর কোনোদিনই পৌঁছন যাবে না।



ও আমার দেশের মাটি

এক যুগ পর আবার বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালাম। শহরতলির গাঁ। এখনো বিজলি আসে নি। সামান্য দূরেই সীমান্ত – একটি মাঝারি নদী, তারপর পাকিস্তান। নদীর পাড়ঘেঁষা সড়ক দিয়ে রিক্সার আলো উড়ন্ত জোনাকির মতো ছুটছে।

দু' দশকেও বাড়িটার কিছুই বদলায় নি। দিঘির পাড়ে এককালের বাগানের সাক্ষী একটি বুড়ো ম্যাগনোলিয়া গাছ, একখণ্ড পড়ো জমি, তারপর চণ্ডীমণ্ডপ ও সদর অন্দরের দালানকোঠা মিলিয়ে পুরোদস্তুর এক বসতি। বাড়িতে লোকজন আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। চণ্ডীমণ্ডপ আর সদর মহলের মাঝখানে একটা গভীর খালের কথা মনে পড়ে, তাতে প্রত্যেক হিস্যার একটি করে কালভার্ট, হুঁশিয়ার না হলে পড়ে যাওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা। তবু আগের দিনের মতোই নিরেট অন্ধকারে থামগুলো হাতড়ে হাতড়ে ঠিক ঘরটির দরজায় পৌঁছে যাই। কৈশোরের স্মৃতিময় আঙিনা। একটু দাঁড়াই। বৃষ্টিঝরা রাতে পরীক্ষার অসহ্য প্রস্তুতি, পূজাআর্চার হুল্লোড়, দেশবিভাগের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। একে একে সবই মনে পড়ে। অবশেষে দরজায় টোকা দিই।

'কে?'

দিদির কণ্ঠস্বর। দরজা খুলে যায়। হারিয়ে যাওয়া সেই ভুবনে প্রবেশ করলে একটি আলোড়ন ওঠে। অন্দর থেকে ছুটে আসেন গৃহকর্তা, অন্যরা। উচ্চারিত অনুচ্চারিত অজস্র জিজ্ঞাসা, বিস্ময় ও অশ্রুপাত, শেষে স্বস্তিতে ফেরা। পঁচিশে মার্চের পর ছ' মাস কেটে গেছে। সীমান্তের এ শহরে শরণার্থীর ঢল নেমেছিল। ঢাকার লোকজনও ছিল। অনেকে আমাকে চেনে। কিন্তু কেউ হদিস দিতে পারে নি। তারা ধরেই নিয়েছিলেন আমি আর নেই।

সেই পুরনো ঘরেই আমাকে শুতে দেয়া হয়। একদা পাশাপাশি দুটো তক্তপোশে চারজন ঘুমাতাম। আমি, রবি, চিত্ত, স্বদেশ ও নানা হিস্যার আত্মীয়। চিত্ত পড়াশোনায় মনোযোগী ছিল না। শীতের রাতে লেপ মুড়ি দিয়ে সামনে বই খুলে ঝিমাত, বিড়বিড় করে পড়া মুখস্থ করার ভান করত। অন্যরা তার বইটি বদলে দিত, ইংরেজির জায়গায় ভূগোল কিংবা বাংলা। আমাদের কেউ তখন বাইরে গিয়ে খড়ম পায়ে গলিয়ে ঘরের দিকে আসত। খড়মের আওয়াজ শুনলে মাতুলের ভয়ে ত্রস্ত চিত্ত হঠাৎ জোরে জোরে একই পড়া আওড়াত এবং শেষে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খেপে যেত, যথেচ্ছা গালাগাল দিত। চিত্ত

এখন যজমানি করে। স্বদেশ হোমিওপ্যাথ, রবি স্কুল-শিক্ষক। গোটা বাড়িটাই খালি। পরবর্তী প্রজন্মের প্রায় সকলেই কলকাতায়।

কিছুতেই ঘুম আসে না। অদ্ভুত সব শব্দ আর চামচিকাদের ওড়াউড়ি। ভাবনাগুলো দূর অতীত থেকে নিকট অতীতে যাতায়াত শুরু করে। চিন্তার ছোট ছোট ঘূর্ণিতে স্মৃতির টুকরোগুলো ডুবে ভাসে। এই তো দু' সপ্তাহ আগেই আমি মেঘনাপারের মাধবদির লাগোয়া একটি গাঁয়ে ছিলাম। সীমান্তের খুব কাছে। গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যেত। হিন্দু-মুসলমান বাসিন্দাদের অধিকাংশই তাঁতী। মিলিমিশে আছে। কোনো কোনো বাড়ি খালি। অনেকে ওপারে চলে গেছে। লুটপাট নেই। অন্যরা আগলে রাখে। ওখান থেকেই একরাতে সিএন্ডবি'র ভয়ঙ্কর সড়কটি পেরোই। শেষ মুহূর্তে কালভার্টের তলায় নৌকার কী হুড়োহুড়ি। যমের হাত ফসকে বেরোনো, তারপর মুক্তাঞ্চলের এক বাজার, সেখান থেকে কাদাভরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আছাড় খেতে খেতে গেরুয়া হয়ে শেষরাতে ভারত সীমান্তের গোঁসাইবাড়ি পৌঁছান। দল থেকে একটু দূরে বসে আবছা অন্ধকারে গাছ গাছালির শোভা দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল কোনো রূপকথার দেশ। এসব মুহূর্তে বয়স খুব কমে যায়, নিজেকে কিশোরও মনে হতে পারে। ত্রিশে মার্চ শহর ছেড়ে রামপুরার মাঠে নেমেও এমনটি মনে হয়েছিল, শীতের শুকনো মাঠের খড়কুটোর অনুপম বর্ণবিলাসে চোখ ঝলসে গিয়েছিল। কিন্তু পরে এসব অনুভূতির অস্থায়িত্ব জেনেছি। ঘাসের ডগায় ভোরের শিশিরবিন্দুর মতো এগুলোও মুহূর্তজীবী।

লণ্ঠনের মিটমিটে আলোটুকুও নিভিয়ে দেই। চালে বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়। চোখ বুজি। ঘুমের বদলে চোখে ভাসে পঁচিশে মার্চের পুরো দিনটির ছবি। সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে গিয়েছিলাম। জমাট আড্ডা। জনৈক তরুণ অধ্যাপক, যারা পরিবার দেশে পাঠিয়েছে, তাদের ভীরুতাকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। অতঃপর ওখানে আর বেশিক্ষণ থাকি নি। নিজের ছেলে-বউকে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই মফস্বল শহরে শ্বশুরবাড়িতে রেখে এসেছিলাম।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি অন্নগ্রহণ করে বিকেলে পার্কের দিকে গিয়েছিলাম। হোটেল ইন্টারকনের ওপর স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, সৈন্যবাহী ট্রাকের অবিরাম চক্কর, লোকজনের ঘোরাঘুরি দেখে দেখে পার্কে ঢুকে বেঞ্চিতে বসি। অসহযোগ চলছে। জরুরি কৃত্যক ছাড়া সবকিছু বন্ধ। চৈত্রের রোদে পার্কের ঘাস পুড়ে গেছে। কেয়ারিগুলো শূন্য। আর কিছুদিন গেলে গোটা পার্কটিই উজাড় হয়ে যাবে। মনে মনে বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠানোর জন্য একটা আবেদনের খসড়া তৈরি করি এবং তখনই হুইলের আওয়াজ শুনে লেকের দিকে তাকাই। বড়শিতে মাছ পড়েছে। মাছ ও মানুষে যুদ্ধ শেষ হতে হতে অন্ধকার গাঢ় হয়েছিল। একটি ঢাউস কাতলা। এত বড় জ্যান্ত মাছ আগে দেখে নি। তারপর বহুদিন ওই লোকটি ও মাছের পরিণতির কথা ভেবেছি। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই তো শহরে মৃত্যু নেমেছিল।

দেরি করেই বাড়ি ফিরেছিলাম। জ্যোৎস্নাজ্বলা বসন্তরাত। গোটা শহর উল্লাস ও আতঙ্কের আশ্লেষে কাঁপছিল। রাত এগারোটার দিকে নিচের তলায় কান্না শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে কী একটা দুঃসংবাদ এসেছিল। তখনও শহরে শ্লোগান থামে নি। দূরদূরান্তর থেকে অবিরাম আওয়াজের রেশ ভেসে আসছিল। বাড়িওয়ালা, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, বাড়ি ফিরেছিলেন আরও পরে। তাঁর ব্যস্ততা দেখে মনে হয়েছিল তিনি ভয় পেয়েছেন। আজও ঘুমের ঘোরে ওই রাতের গুলিগোলার কর্ণভেদী শব্দ শোনি, ট্রেসার বুলেটের আলো চোখ ঝলসায়।

দিদির ডাকে অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে। প্রতীত হতে কিছুটা সময় লাগে যে ঢাকায় নেই। হাতমুখ ধুতে ছেলেবেলার মতো পুকুরঘাটে রওনা হই। চণ্ডীমণ্ডপে ছোটখাটো মিটিং বসেছে। বাড়ির কর্তাকে ঘিরে একটা শলাপরামর্শ চলছে। অবাক হয়ে দাঁড়াই। রাজনীতিবিমুখ এই শিক্ষকটি আমাকেও পড়িয়েছেন। কিছুদিন আগে ক্যানসারের অপারেশন হয়েছে। পেটে একটা থলে সাঁটা। এভাবেই বাকি জীবন কাটবে। এতসব সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন কেন, কী লাভ তাতে? ওদেশের প্রতি তাঁর উচ্ছ্রিত প্রেম থাকার কোনো হেতু নেই। পঞ্চাশের পর তাঁর আত্মীয়রা উদ্বাস্তু হয়েছেন, এদেশে এসে নিঃস্ব ধ্বংস হয়েছেন। তবে, তবে কি অবশেষে মধ্যযুগের অবশিষ্ট সেই দুর্গল ক্লেদস্তরে ফাটল ধরেছে, আমরা কি নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করছি? এমন একটা ভাবনা আমাকে কিছুক্ষণ আবিষ্ট রাখে।

দুপুর নাগাদ শহরে রওনা হই। স্মৃতির শহর। স্কুলে কলেজে পড়েছি। প্রতিটি ধূলিকণাও চিনতাম। তারপর একযুগ পেরিয়ে গেছে। এখন চেনা-অচেনার মেশামেশি। চলেছি যেন পূর্বজন্মের রাস্তা ধরে। এই তো সেই উঁচু কাঠের পুল, লাগোয়া ফাত্তাহদের পাড়া। সুপারি বাগানের মধ্যে ছোট ছোট ঘর। একদা নীল চেক-শাড়ি পরা মাথায় ঘোমটা বৌ-ঝিদের ব্যস্ত চলাফেরা ছিল। এখন কেউ নেই। পঞ্চাশের পর গোটা গাঁ ওপারে উঠে গেছে। গাঁয়ের শেষে মসজিদ, আজও তকতকে, কেউ দেখাশোনা করে নিশ্চয়ই। সামনেই শহর, রাস্তার একপাশে সরকারি স্কুল, অন্য পাশে পিডবলিউ'র অফিস, ডানে কাচারিটিলা থানা গির্জা, বাঁয়ে পাবলিক লাইব্রেরি টাউনহল রামকৃষ্ণ মিশন পোস্ট-অফিস, সামনে নদী, নদীতে মিশেছে শহরের বুকচিরে আসা একটি খাল। নদীর ওপারে পাকিস্তান। খালের পার দিয়ে খানিকটা গেলেই মস্ত পুল, পুল পেরুলেই বাজার মাদ্রাসা, একটু দূরে কলেজ, রেলস্টেশন। এই তো গোটা শহর।

আমি হেঁটে চলি, লক্ষ্যহীন। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াই। কোনো কোনো বাড়ি দেখে ভাবি যেন ওখানে বহুদিন এসেছি, কিন্তু লোকজন উপলক্ষ কিছুই মনে পড়ে না, ভেতরে কী যেন তড়পায়, ক্লান্ত করে। কখনো-বা কারও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ওকে কি কোনোদিন চিনতাম? সহপাঠী অজিত, নাকি বন্ধু বেনীমাধব? রউফ নয়তো? তারা কেউ দাঁড়ায় না, ভ্রূক্ষেপ করে না।

এক সময় যজ্ঞেশ্বর দাসের বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাই, ভাবি এখনই বেরিয়ে এসে বলবেন — 'ঠিক বলতাম না, তোমরাই পথ দেখাবে?' না, কড়া নাড়লে তিনি বেরুন না। একটি যুবককে দেখা যায়। সম্ভবত তাঁর ছেলে। জানা যায় গৃহকর্তা অনেকদিন জেলে। নিরাপত্তা বন্দী। বিস্তারিত পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই বসা যেত। এ বাড়িতে আমি অচেনা নই। বহু বৈঠকে হাজির থেকেছি। সুখদুঃখের ভাগ নিয়েছি। অদ্ভুত ভালমানুষ এই যজ্ঞেশ্বর দাস। পার্টির জন্য সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন। এই বাড়িটুকু টিকিছে কেবল স্ত্রীর বাধায়। সম্ভবত বৃদ্ধ বয়সে নকশালি হয়ে গেছেন।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে গন্তব্য নিয়ে ভাবি অজিতদের খোঁজ নিলে কেমন হয়? ওর দিদি, বালবিধবা, মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতেন, তাঁর দৃপ্ত ভঙ্গিটি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। অবারিত দ্বার ছিল সেখানে। বাড়ির সামনের একটি কৃষ্ণচূড়া গাছে গ্রীষ্মে ফুলের ঢল নামত। রবীন্দ্র-জন্মদিনে ডাল ভেঙে স্কুলের মঞ্চ সাজাতাম। আজ সেখানে পৌঁছে দেখলাম গাছটির শুধু ধড় আছে, ডালপালা নেই। ওদের সেই টিনের ঘরটির জায়গায় একটি অসম্পূর্ণ দালান অনেকদিন পড়ে আছে, ইটে শেওলার সবুজ।

আবার হাঁটতে থাকি। এক সময় নিজের স্কুলে পৌঁছাই। গরমের ছুটি। কেউ কোথাও নেই। শূন্য বারান্দায় ঘুরে বেড়াই। সহপাঠী ও শিক্ষকদের মুখ চোখে ভাসে, কিন্তু সব নাম মনে পড়ে না। স্বপ্নচালিতের মতো আবার পথে ফিরে কেবলই হাঁটি, কোনো গন্তব্য খুঁজে পাই না। একটি জমকাল ক্লিনিক দেখে দাঁড়াই। ডাক্তারের নাম চেনা মনে হয়। সহপাঠী বন্ধু। তবু ভেতরে যাওয়ার তাড়া বোধ করি না। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার অস্বস্তি ইতোমধ্যে জেনেছি। আগরতলা থেকে আসার পথে নলিনীর বাড়ি গিয়েছিলাম। সারাদিনেও বলার মতো কথা খুঁজে পায় নি। সময় একটা অদৃশ্য দেয়াল গড়ে তোলে, বন্ধুদের আলাদা করে রাখে। গোটা বাড়িটাকে ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল এবং শেষে নলিনী যখন আমাকে এখানে থেকে তার মেয়েটির আসন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাহায্য করতে বলেছিল তখন দম আটকে আসছিল, রাতে ঘুমুতে পারিনি এবং ত্বরায় ভোরের প্রথম বাসটি ধরেছিলাম।

বন্ধুর দরজা পেরিয়ে এগোই। সামনেই শহরের বুকচেরা সেই খাল। একদা বহতা ছিল। নৌকা চলত। এখন বাঁধ পড়েছে, জলে কচুরিদাম, মশার আড়ত, শহরের আঁস্তাকুড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবি, মাছের চাষের সঙ্গে খালটিতে জলোদ্যান বানাই, পদ্ম-শাপলাসহ নানা গাছপালার তালিকা তৈরি করি, সানবাঁধান পাড়ে পুষ্পিত বৃক্ষরাজির শোভা দেখি এবং শেষে উন্নয়নশীল দেশের অদূরদর্শী কূপমণ্ডুক পৌরপিতাদের ধিক্কার দিই।

এই গন্তব্যহীন যাত্রার এক পর্যায়ে একটি চৌমাথায় এসে দাঁড়াই। উঁচু বেদীর ওপর একটি মূর্তি — সুভাষচন্দ্র, মহাসড়কের দিকে ধাবমান যানবহরের ধূলিদাক্ষিণ্যে মলিন, বিষণ্ণ। অনেকক্ষণ ভাস্কর্যটি দেখি। আমাদের যৌবনের হিরো নেতাজী। আজাদহিন্দ

ফৌজের উদ্দাম দিনগুলো মনে পড়ে। স্কুলে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছিলাম। এই মুহূর্তে কেন যেন 'সুখী রাজপুত্র'র গল্পের কথা মনে পড়ল।

শহর আমাকে ঠেলে ঠেলে আপন চৌহদ্দি থেকে বের করে দেয়। এই তো সীমান্ত, সামনে অশ্রুমতী নদী। ওপারের জমিতে কেউ ধান বোনে নি। শূন্য মাঠ। একটিও গবাদিপশু দৃষ্ট হয় না। জনমানব নেই, যেন প্রাণিজন্মের পূর্বেকার পৃথিবী। এই আদিম ধরিত্রীতে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখি। দিগন্তে ঢেউখেলান পাহাড়ের নীলে লালের ছোঁয়া লাগে। চরাচর স্তব্ধতর হয়। নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার এক প্রবল তাড়নায় সামনে এগোই এবং তখনই দিগন্ত থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ আসে। থমকে দাঁড়াই, কিছু একটা ঠাহর করার চেষ্টা করি। কিছুই স্পষ্ট হয় না। তারপর দ্রুত আঁধার নামলে এক অদ্ভুত গুনগুনানি ওঠে, উৎস স্পষ্ট হয় না। মনে পড়ে মেজদির মৃত্যুর পর কৈশোরে শোনা প্রৌঢ়া জননীর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতকল্প বিলাপ, করুণ শোকগাথা। সম্মোহিত চলৎশক্তিহীন ওপারে বিরান মাঠের কিনারের গ্রামগুলোতে জমাটবাঁধা অন্ধকারের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকি।



একাত্তরের কতিপয়

'আমরা আত্মঘাতী, কৌরবদের সংহার করে
নিজেরাই বিনষ্ট হয়েছি। আমাদের জয়লাভ
হয় নি, তারাও জয়ী হতে পারল না।'—
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ (মহাভারত)

যুদ্ধবিরোধী সাহিত্যের অন্যতম রত্নকোষ এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'ওল কোয়ায়েট' পড়েছিলাম ছেলেবেলায়, এখনও কিছু কিছু ঘটনা মনে আছে — চাষীবাড়ি থেকে সৈনিকদের মুর্গি চুরি, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সৈনিকজননীর বিনিদ্র নিশিযাপন, পশ্চিম রণাঙ্গনের নৈশব্দ্যে উড্ডীন রঙিন প্রজাপতি, কিন্তু ভুলে গেছি বইয়ের দ্বিতীয় মলাটে যুদ্ধশেষের ভয়াবহ শূন্যতা সম্পর্কে লেখা অনবদ্য পঙক্তিমালার প্রায় গোটাটাই, সম্ভবত এই ধরনের কিছু বাক্য ছিল 'এ শান্তি শ্মশানের, অবসানের ।' সব যুদ্ধই তো আসলে ভ্রাতৃঘাতী, মুক্তিযুদ্ধও ব্যতিক্রম নয়, ফলশ্রুতিতেও হেরফের ঘটে না। যুদ্ধশেষের সর্বোত্তম মীমাংসাও ঘৃণার উত্তুঙ্গ দেয়ালে দীর্ঘকাল চিড় ধরাতে পারে না, মানবজাতির বিচ্ছিন্নতা সামূহিক হয়ে ওঠে। অথচ এ থেকে মুক্তি প্রয়োজন। ঘৃণার বোঝা দুর্ভর, গ্লানিকর ও আখেরে অবক্ষয়ী। যুদ্ধ যুদ্ধই। তবু মানুষও মানুষই। যুদ্ধের ব্যাপক পাশবিকতায়ও সে মনুষ্যত্ববোধের সবটুকু খুইয়ে বসে না। কচি দুটি সন্তানসহ জনৈকা ইহুদি মাকে গ্যাস-চেম্বারে ঢুকতে দেখে তাই ফ্যাসিস্ট পাহারাদার আত্মহত্যা করে বসে। সংখ্যার দিক থেকে অতিনগণ্য হলেও এসব ঘটনা অমিত অন্তর্শক্তিধর, প্রবল উৎসেচকতুল্য, সাগরপ্রমাণ ঘৃণার ভিত টলিয়ে দিতে এগুলোর অণুমাত্রাই যথেষ্ট। এটা মনে রেখেই আরেকটি ঐতিহাসিক বিজয়ধন্য স্বাধীনতা দিবসে নিবেদিত হল 'একাত্তরের কতিপয়'।

এক

ভোলানাথ শর্মার সঙ্গে দেখা ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর শহরের লাগোয়া উপ্তাখালী উদ্বাস্তুশিবিরে একাত্তরের ১৩ নভেম্বর। আমি তখন প্রবাসী বাংলাদেশ শিক্ষাসমিতির কর্মী হিসেবে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে 'জয়বাংলা'র শরণার্থীদের তথ্যাদি সংগ্রহ করতাম। শ্রী

শর্মা চাঁটগার লোক, ঢাকায় ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। ২৫ মার্চের গণহত্যা ও পরবর্তী দুর্যোগগুলো কাটিয়ে পাকাপোক্ত হয়েই কর্মস্থলে বসেছিলেন। পাকিস্তান সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে আপন নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জুলাই মাসের দিকে সরকারি সিলমোহরমারা পরিচয়পত্রটি পকেটে গুঁজে সস্ত্রীক গৃহপানে চলেছিলেন দিনকয়েকের ছুটিতে। চাঁটগা শহর ছাড়িয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর রাজাকাররা বাস থামিয়ে তল্লাসি চালায় এবং একমাত্র হিন্দুযাত্রী শর্মাকে সস্ত্রীক নামিয়ে নিয়ে পাশের মিলিটারি ক্যাম্পে হাজির করে। পাহারাদার সিপাই তাদের একটি বেঞ্চি দেখিয়ে দেয়। কাছেই খুঁটিতে বাঁধা দুটি লোককে বেধড়ক পিটান হচ্ছিল। শর্মা নিজভাগ্য অনুমান করতে পারছিলেন। তখন দুপুর। ক্যাম্পের কর্তা খোলা জায়গায় গোছল করছিল। নধর দেহ, সুবর্ণকান্তি। অতঃপর নির্বিকার সেই লোকটি খেতে বসল ও শেষে ঘুমুতে গেল। ইতোমধ্যে শর্মার জন্য একপ্লেট রোস্ট এলো আর তখনই প্রহর্তা সিপাইটি ভোলানাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্যাপটেনের হুকুম নেই এই ওজর দেখিয়ে পাহারাদার তাকে নিরস্ত করলেও 'মেহমানের' পক্ষে অতঃপর আহার্যভোগ অসম্ভব হয়ে ওঠল। গলা শুকিয়ে গেছে, খাবার নামছে না, অথচ না খেলে মেজবানের না-খুশ হওয়ার মারাত্মক পরিণতিও শর্মাকে হিসাবে নিতে হচ্ছিল। অন্দরে ঘোমটাপরা স্ত্রী কাষ্ঠবৎ, নিজের শরীর অসাড়প্রায়। সময়ে বোধও লোপ পাচ্ছিল।

বিকেলের দিকে তাবু থেকে তলব আসে। বলির পাঠার মতো ভোলানাথ ক্যাপ্‌টেনের সামনে দাঁড়ান এবং প্রশ্নের জবাবে যন্ত্রের মতো অবিরাম আওড়ে চলেন — হিন্দু হলেও তিনি বিশ্বস্ত পাকিস্তানি, রাজনীতির ত্রিসীমানাও কোনদিন মাড়ান নি, একবারও ইন্ডিয়া যান নি, সরকারি হুকুম মান্য করে যথাসময়ে কাজে যোগ দিয়েছেন, এখন ক'দিনের ছুটিতে গাঁয়ে যাচ্ছেন মা-বাবাকে দেখতে।

ক্যাপ্টেন একটি সাদা কাগজ এগিয়ে দিয়ে তাকে তাতে সই করতে বলেন এবং বাসস্ট্যান্ডে প্রহরারত রাজাকারদের ডেকে পাঠান। ওরা এলে তাদের কাগজটি দেখিয়ে সস্ত্রীক ভোলানাথকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এই ধরনের সইসহ একটি চিঠি নিয়ে আসতে বলেন। অতঃপর তারা নিরাপদেই গাঁয়ে পৌঁছেন ও পরদিন সীমান্ত পাড়ি দেন।

দুই

আমাদের বাড়ি সিলেটের বড়লেখা উপজেলার অখ্যাত শিমুলিয়া গ্রামে। কাছে একটি নগণ্য রেলস্টেশন থাকলেও লাগোয়া কোনো বড় সড়ক নেই, নেই ত্রিসীমানায় অন্য কোন হিন্দুর বাড়ি। একদা এলাকাটি হিন্দুপ্রধান ছিল, পঞ্চাশের পর শূন্য হয়ে যায়। শ্বশুরের ভিটাত্যাগে অনিচ্ছুক আমার মায়ের অটল জেদের জন্যই আমরা থেকে গিয়েছিলাম। পরিবর্তিত আবহের নানা টানাপোড়েন সত্ত্বেও প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি ভালই ছিল। জুলাই মাসের শেষে একদিন আমাদের বাড়িতেও জনকয়েক পাকসৈন্য হাজির হয়। জনৈক শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে খবর পেয়ে অগ্রজরা বনেবাদাড়ে লুকোন। বৌদিরা প্রতিবেশীদের গৃহে আশ্রয় নেন, শুধু দরজা আগলে দাঁড়ান পঞ্চাশের দৃপ্ত প্রৌঢ়া একাত্তরের

ন্যুব্জ বৃদ্ধা আমাদের গর্ভধারিণী। তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ও মাথা থেকে রক্তপাত ঘটিয়ে ওরা ঘরে ঢুকে এবং তন্ন তন্ন করে খুঁজেও টাকাকড়ি সোনাদানা না পেয়ে পিতার গ্রন্থসংগ্রহের অবশিষ্ট ভস্মসাৎ করে এবং পিতামহের আমলের ধাতুভস্ম, সালসা, মোদক ও তৈলাদির বড় বড় পাত্র ভেঙ্গে রেখে বিদায় হয়।

কিছুদিন পর আরেক দৃশ্য। বাড়িতে তখন মা একাই থাকেন। অন্যরা আশ্রয় নিয়েছেন হাকালুকি হাওড়ের দুর্গম এলাকায়। বারবাড়িতে চেয়ারে বসে আছে জনৈক পাক ক্যাপ্টেন। তাকে ঘিরে গাঁয়ের মাতব্বরবর্গ। লোকটির দুরারোগ্য চর্মরোগ। মারও আয়ুর্বেদে দখল ছিল এবং বড়দার অনুপস্থিতিতে তিনিই রোগীদের ওষুধপত্র দিতেন। কয়েক প্রজন্মের প্রাচীন এই 'ধন্বন্তরী' ঘরানার খবরটি কোন মোসাহেব ওই ক্যাপ্টেনকে পৌঁছে দিয়ে থাকবে। মা তাকে মনোযোগসহ পরীক্ষা করেন এবং বলেন যে এজন্য দীর্ঘদিন চিকিৎসা প্রয়োজন ও কবিরাজি ওষুধ সেবনকালে মাংসাহার বর্জনীয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ক্যাপ্টেন সবিনয়ে এতে তার অপারগতা জানান এবং উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের মাকে সেলাম করে মাতৃসম্বোধনে সার্বিক নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নেন।

তিন

ঢাকার নটরডেম কলেজে আমার সহকর্মী রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক তমাল দত্ত অবসরকালে জর্মন শিখতেন। একাত্তরের ২৪ মার্চ তার জর্মন শিক্ষক তাকে দ্রুত ঢাকা ত্যাগ করতে বলেন। তিনি থাকতেন অ্যাডভোকেট ভগ্নীপতির বাড়ি, বোন পড়াতেন সিলেট মহিলা কলেজে, ছুটিছটায় ঢাকা আসতেন। তারা ২৫ মার্চ রাতের গাড়িতে সিলেট রওয়ানা হন এবং নিরাপদেই পৌঁছেন। সিলেট শহর পাকবাহিনীর দখলে যাওয়ার আগে তমাল গ্রামে চলে গেলেও তার বোন ও ভগ্নীপতি শহরেই থেকে যান। ৯ এপ্রিল পাকসৈন্যরা শহর দখলের পর কারফিউ জারি করে ঘরে ঘরে তল্লাসি চালায় এবং তমালের বোন ও ভগ্নপতিকে গ্রেপ্তার করে অন্যদের সঙ্গে মাঠে এনে বসায়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তমালের বোন অধ্যাপিকা শুনে কর্মরত অফিসারটি হঠাৎ থমকে যায় এবং তাকে ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এসে তাদের জানায় যে ভারতে না গিয়ে তারা মস্তবড় ভুল করেছেন, আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের খতম করার কড়া হুকুম তাদের। অগত্যা একজন পাহারাদার বসিয়ে সে বিদায় নেয়। অফিসারটি পরে জানায় যে সে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিল এবং সেজন্য একজন শিক্ষিকার জীবনরক্ষা আপন কর্তব্য বিবেচনা করেছে। দখলদারির গোটা আমলটাই তারা নিরাপদ ছিলেন। অফিসারটি চট্টগ্রাম বদলি হওয়ার সময় তার অনুপস্থিতিতে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় সে তাদের ভারত সীমান্তে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা রাজি হন নি। সে চট্টগ্রাম থেকে তাদের নিয়মিত টেলিফোন করতে ভুলত না। পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর তমালের ভগ্নপতি অফিসারটির অনুকূলে কাগজে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

সিলেটের স্বনামখ্যাত সমাজসেবী ও কংগ্রেসকর্মী নিকুঞ্জ গোস্বামীও এমনি আশ্চর্যভাবে বেঁচে যান। গত সেপ্টেম্বর মাসে তার সঙ্গে দেখা। তিনি বর্তমানে উমেশচন্দ্র

নির্মলাবালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ। জিজ্ঞেস করেছিলাম 'থেকে গিয়েছিলেন কেন?' জবাব দিলেন 'এমনিই। ভেবেছিলাম আমার তো কেউ নেই, দেখি-না কী হয়।' এই চিরকুমার অজাতশত্রু বলেই সম্ভবত ভয় পান নি। পাকবাহিনীর লোকেরা তাকে একটি কাগজের সম্পাদক করার লোভ দেখিয়ে কৌশলে আটক করেছিল। তিনি সেটা বুঝতে পারেন নি। দিনে মুক্ত থাকতেন, রাতে ঘরে তালা পড়ত। একরাতে কার ডাক শুনে ঘুম ভাঙ্গে। চিনতে পারেন শান্তিকমিটির এক নেতা। লোকটি জানায় কাল সকালেই তাকে গুলি করে মারা হবে, আজ রাতটুকুই তার পরমায়ু। বিভ্রান্ত নিকুঞ্জবাবু তাকে যথাকর্তব্য জিজ্ঞেস করলে সে বলে 'আপনি স্বদেশী, জেল-দ্বীপান্তর কেটেছেন আর আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কী করবেন?' গোস্বামী হঠাৎ দিব্যদৃষ্টি পেলেন। শৌচাগার দিয়ে পালিয়ে রাতে সুরমা নদী সাঁতরে গাঁয়ে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচান।

চার

'কত কথা কত স্মৃতি' গ্রন্থের লেখক শ্রী দীনেশচন্দ্র দেবনাথের ঘটনাটিও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। তিনি তখন রংপুরের সাব-জজ। সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে শেষে শহরে ফিরে আসেন ও কাজে যোগ দেন। তিনি লিখেছেন 'পরদিন শুক্রবার খুব ভোর হতেই রটে গেল গতরাতে রংপুর টাউন থেকে ৪০ জন হিন্দু মারা হয়েছে। রংপুর শহরে আর একটিও হিন্দু নাই। এসব শুনেই যথানিয়মে শুক্রবার সকালে কোর্টে গেলাম।' তাকে মুসলমান করে বাঁচান যায় কিনা এমন প্রস্তাব নিয়ে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী ক্যান্টনমেন্টে যায় এবং প্রায় দেড়ঘণ্টা পর ফিরে এসে জানায় যে তিনি বেঁচে আছেন শুনে সেনা-অফিসার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলেছে 'বলেন কি? সাব-জজ সাহেব এখনও বেঁচে আছেন? অসম্ভব! গতরাতে যে ৪০ জনকে মারা হয়েছে সেই লিস্টের এক নম্বরে সাব-জজ সাহেব। গতরাতে কিলিং-পার্টি সেই চল্লিশজনকে মেরে রিপোর্ট দিয়ে গেছে। তাজ্জব ব্যাপার... তিনি মুসলিম হবেন কি হিন্দু থাকবেন এসব আমি ভাবছি না, ভাবছি এভাবে তিনি বাঁচলেন কি করে? এভাবে কেউ বাঁচে না, তবু যখন বেঁচেই গেছেন তখন মনে হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তিনি বেঁচে থাকুন। তা হলে বেঁচেই থাকুন তিনি।' দীনেশবাবু আজও বেঁচে আছেন, তার জন্য বিশেষ সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা হয়েছিল সেদিন।

পাঁচ

শেষ কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত ও বড়ই মর্মস্পর্শী। লোকটিকে দেখি নি, তবু তার একটি কল্পিত মুখ চোখে ভাসে, মনে হয় তাকে নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ছোটগল্প লেখা হতে পারে।

ঘটনার অকুস্থল সিলেটের পূর্বসীমান্ত, পাথারিয়া পাহাড়ের একটি সীমান্তফাঁড়ি। সিপাইরা সবাই বাঙালি, তাদের কর্তাটিই শুধু উর্দুভাষী। একাত্তরের এপ্রিল। লোকটি তার অবস্থা আঁচ করতে পারে। ফাঁড়ির বাইরে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু, ফাঁড়িতেও মৃত্যু সহবাসী। সিপাইরা তাকে মারার সলাপরামর্শ করছে তেমন সন্দেহ তার মনে দানা বাঁধে। সন্দেহে সত্যতা ছিল। কিন্তু একটি নিরপরাধ লোককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে ওরা চায় না, আবার

বাঁচিয়ে রাখাও চলে না। এমন অসহায় পরিস্থিতিতে লোকটি ক্রমেই মানসিক ভারসাম্য হারাতে থাকে। এক শুক্রবারে পালানোর সুযোগ দেয়ার জন্যই ওকে একা রেখে বাকিরা গাঁয়ের মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে তাঁর রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। নিজেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে।

ছয়

'কোন মানুষই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়, সে সমগ্রের একাংশ, প্রত্যেকেই মূল ভূখণ্ডের একটা অংশ, প্রত্যেক মৃত্যুই আমাকে খাটো করে, কেননা আমি গোটা মানবজাতির সঙ্গে যুক্ত; তাই কার জন্য মৃত্যুঘণ্টা বাজছে তার খোঁজ করো না; এটা বাজছে তোমার জন্য।'
—জন ডান



পিতৃব্যের প্রস্থান

ইদানিং পিতৃব্য আমার ওপর আছর করেছেন। নিদ্রায় জাগরণে বারবার তাঁকে দেখি — কখনও দেশত্যাগের প্রাক্কালে পিতৃপুরুষের ভিটেয় বিচরণরত বিস্রস্ত, কখনও আবার দেশান্তরে নতুন তৈরি বাড়ির উঠানে বসা, ধ্যানস্থ। ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। মাতাঠাকুরুন উপকথাকল্প কৃচ্ছ্রতা ও কৌশলে সুদিলগ্নি ব্যবসার জাঁতাকলে স্থানীয় কিছু বিলাসী তালুকদারকে নিঙড়ে-মুচড়ে বিত্তটি অর্জন করেন। আজও আমার চোখে ভাসে বারান্দায় উঁচু তক্তপোষ, একপাশে কাল রঙের মজবুত সিন্দুক, তাতে ঠেস দিয়ে বসা হাড্ডিসার এক বৃদ্ধা, অনবরত কাঁশছেন, পাশে কফ ফেলার ডাবর, চোখের সবটুকু উজ্জ্বলতা দিয়ে অনুক্ষণ জরিপ করে চলেছেন আপন ভুবনের গোটা ভূগোল এবং উৎকর্ণও, যেন ধরতে চান যাবতীয় সংশয়ী আলোচনার রেশটুকুও। পিতৃব্যের তখন যৌবনকাল, সুশ্রী নধরকান্তি। আনুষ্ঠানিক বিদ্যালাভ ঘটেনি, তবে ভালই দখল ছিল সংস্কৃত ও ইসলামি শাস্ত্রে, নিয়মিত পড়তেন পত্রপত্রিকা। যাবতীয় গ্রামীণ সালিশের মধ্যমণি তিনি। অনর্গল উদ্ধৃত করতেন হিন্দু-মুসলিম শাস্ত্রের লাগসই বিধিবিধান। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রে গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রথম সালিশে অনামন্ত্রিত থাকার আঘাতটা বুকে খুব বেশি বেজেছিল এবং তখনই আসন্ন অশুভের আলামত আঁচ করেছিলেন। এই মানসিক টানাপোড়নের সময়ই বাধে পঞ্চাশের দাঙ্গা এবং পূর্বোক্ত অদূরদর্শী তালুকদারদের নিঃস্ব বংশধররা হৃতসম্পদ পুনরুদ্ধারে উদ্যত এমন একটি গুজব শোনার পর পিতৃব্য প্রজাপরিজনসহ দ্রুত দেশান্তরী হন এবং এদিকে আর কোনদিন পা-বাড়ান নি।

পিতৃব্যের সঙ্গে ফের সাক্ষাৎ দু'দশক পর একাত্তরের সংগ্রামের দিনে। দেখলাম চেহারা তেমন বদলায় নি, চুলগুলোই কেবল স্বাভাবিক বর্ণাভা হারিয়েছে। গৃহে জয়বাংলার শরণার্থীদের ভিড়, তবু হাসিমুখে স্বাগত জানান এবং বলেন এখানে ডালভাতের কোন অভাব নেই, তবে চুর্ব্যচুষ্য খাওয়াতে অপারগ।

সবে ভারতে পৌঁছেছি। আপাতত কোন কাজকর্ম নেই। ঘুরে বেড়াই এবং শরণার্থীশিবিরে চেনাজানা লোকজন খোঁজি। পেয়েও যাই, তাদের সঙ্গে গল্পগুজবে সময় কাটে। শহরটি খুব ছোট, একটি দিঘিঘিরে কিছু দোকানপাট, একটি সিনেমাহল, টিলার ওপর কোর্ট, তিনটি উচ্চবিদ্যালয়, কোন কলেজ নেই, আরও আছে রামকৃষ্ণ মিশন ও

একটি মসজিদ। শহরে নেই কোন মুসলমানের বাস, ওদের কোন খাবার দোকান, তারা আসেন দূর গ্রাম থেকে বাজারবারে, প্রায় সবাই চাষাভুসো মানুষ। পঞ্চাশের উদ্বাস্তু হিন্দু আমজনতা ঘোর সাম্প্রদায়িক, আমার পিতৃব্যও ব্যতিক্রম নন, জয়বাংলা নিয়ে রোজই মশকরা করেন এবং আমাকে শোনান যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও আমরা চিরদিন সংখ্যালঘুই থাকব, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের অপমান আমাদের ঘুচবে না।

এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না। তাই রোজ সকালেই বেরিয়ে পড়ি, যাই শরণার্থীদের কাছে আর এভাবেই একদিন খলিলের সঙ্গে দেখা। আমাদের গাঁয়ের ছেলে। আমাকে অবাক করে জানায় সে মুক্তিযোদ্ধা, ইতোমধ্যে কয়েকটি অপারেশনও করেছে। তার কাছেই শুনলাম এলাকার খবর। সেখানে কোন হিন্দু নেই, আমাদের বাড়িতে কেবল মা থাকেন, অন্যরা কোথায় সে জানে না আর লন্ডনীরা আছে বড়ই বিপদে, তাদের জোয়ান ছেলেরা সবাই এখন ভারতে, কেউ কেউ যুক্তিযুদ্ধেও। আরেকটি আশ্চর্য খবরও সে শোনায়। গাঁয়ের দাগী চোর বলু ও তার ছেলে কটাই এখন মুক্তিযোদ্ধাদের গাইড, এলাকার অলিগলি তাদের নখাগ্রে, এদের অন্ধকারে চতুর চলাফেরার অভিজ্ঞতা খলিলদের খুব কাজে লাগছে।

খলিলরা পিতৃব্যের প্রাক্তন প্রজা এবং তার বাবা ও চাচা এককালের কর্মচারী, একান্ত অনুগত ও আত্মীয়তুল্য। সেই ভরসায় খলিলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরি। পিতৃব্য যথারীতি উঠানে বসে কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখে মুখ তুলে তাকান ও নবাগতের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। আমি বিস্তারিত জানাই ও তখনই সেই অভাবিত ঘটনাটি ঘটে। তিনি আস্তে আস্তে খাড়া হন, খলিলকে হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কী বলেন স্পষ্ট শ্রুত হয় না, শুধু একটি বাক্যই বারবার পুনরাবৃত্ত হতে থাকে 'তোর বাপ কইরে বেটা, আমরা কে কানোরে বাবা।' আমি হতবাক। এই মানুষটিকে তার সাম্প্রদায়িক মনমানসিকতার জন্য চিরদিন অপছন্দ করেছি, অথচ এখন এ কী দেখছি! মানুষের মন অদ্ভুত এক বস্তু।

তারপর শুধু পিতৃব্য নয়, অন্যদেরও মনবদল লক্ষ করি। এই অঞ্চলের মানুষ বাংলাদেশের নবপ্রজন্মের মুসলমান ছেলেমেয়েদের দেখে নি, ওরা শিক্ষাদীক্ষায় কতটা এগিয়েছে এই খোঁজও রাখে নি। পিঠে বন্দুক ঝুলানো বীরবেশী এই যুবকরা, আধুনিক পোশাকের স্মার্ট মেয়েরা তাদের বড়ই অচেনা লাগে। তারা দীর্ঘলালিত কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে, আপন গৃহে তাদের স্বাগত জানায়, ছুঁচিবাই ভুলে যায়, সাহায্যের হাত বাড়ায়। আমি এটুকুই দেখেছি। তারপর চলে যাই কলকাতা। বাকিটা ভাইঝির মুখ থেকে শুনে লেখা, গোটা মুক্তিযুদ্ধের সময়টা সে ছিল আমার ওই পিতৃব্যের কাছে।

যুদ্ধশেষে পিতৃব্যকে বড়ই বিষণ্ণ দেখায়, সম্ভবত কোন একটা হিসেব মিলাতে গলদঘর্ম। আমরা যারা পঞ্চাশে দেশত্যাগ করিনি তাদেরই শেষপর্যন্ত জয় হয়েছে এমন একটা ভাবনা হয়ত-বা তাকে পীড়া দিতে থাকে। এখন তর্কবিতর্কে নিস্পৃহ পিতৃব্য সারাদিন ঝিমান। শরণার্থী শিবিরগুলো খালি হতে থাকে। তার সংসারের আশ্রিতরাও দেশে ফেরার উদ্যোগ নেয়, তাদের নিঃশব্দ উল্লাস তাঁকে বিব্রত করে। আমার ভাইঝির

বাড়ি ফেরার দিনক্ষণও ঠিক হয়। খলিল খোঁজ নিতে আসে। সে বলে —'চলইন চাচা, আব্বা আফনারে বড় দেখতে চাইন।'

— তোর বাপরে আইতে কইস।

— তাইন তো বিছনা থাকি উঠতা পারইন না।

— তোর চাচারে পাঠাইস।

— তাইন তো নাই চাচা।

— নাই, কিতা কইস?

— ওয় চাচা। বাড়িত মর্টারর শেল পড়ছিল।

পিতৃব্য আবারও অন্ধকারে হাতড়ান। কোন কথা বলেন না। কূলকিনারাহীন এক সায়রে হাবুডুবু খান। ভাইঝি ফেরার আয়োজন শুরু করে এবং একদিন রওয়ানাও হয়। তিনিও তাদের সঙ্গ নেন। আসেন কিছুদূর, তারপর এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে যান। তাকে অসম্ভব ক্লান্ত মনে হয়। পাদুটি যেন মাটিতে সেঁধে যায়। নড়তে পারেন না। সঙ্গে আসতে সকলে বারবার অনুনয় করে। চোখে জলের রেখা ক্রমশ স্পষ্টই হয়। নীরবে সকলকে এগিয়ে চলার ইঙ্গিত দেন। সামনে পেছনে দেশে ফেরা মানুষের দীর্ঘ সারি। ভাইঝিকেও এগুতে হয়। সে ফিরে ফিরে তাকে দেখে, ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন শিলামূর্তির মতো। এক সময় রৌদ্রের আশ্লেষে ছায়ার মতো কাঁপেন এবং শেষে অদৃশ্য হন। তারপর পিতৃব্য আর বেশিদিন বাঁচেন নি।



মুক্তিযোদ্ধা এক শিক্ষক

'বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের অগ্রে যাঁহার নাম
একাত্তরের ঘাতক যাঁকে খুঁজেছিল অবিরাম। – অবিচল

শিক্ষক, শিক্ষা-আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষনেতা, মুক্তিযোদ্ধা, বরিশালের সকল প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের পুরোধা আব্দুল গফুর ৩০ নভেম্বর (২০০২) ঢাকায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় লোকান্তরিত হয়েছেন। কত হাজার বারই তো আমাদের দেখা হয়েছে, কিন্তু ২৮ নভেম্বর বরিশালে আমাদের বাসায় তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপটিই যে শেষদেখা তা ছিল দুঃস্বপ্নাতীত। বয়স হলেও প্রবল প্রাণবন্ত এই মানুষটি ঢাকার শ্যামলী থেকে দিব্যি হেঁটে সিদ্ধেশ্বরীতে আমাদের বাসায় আসতেন। ডায়বেটিসে আক্রান্ত হলেও রোগটি তাকে এতটুকু কাবু করতে পারে নি। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা আত্মরক্ষার কত কৌশলই তো জানতেন, তার এমন মৃত্যু বড়ই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। গফুরের বয়স কত হয়েছিল আমি সঠিক জানি না। আমি চিরদিন তাকে কনিষ্ঠই ভেবেছি এবং সেভাবে আমাদের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য এক শিক্ষক সম্মেলনে যোগদানের আনুষ্ঠানিকতা সারার জন্য ঢাকা এসেছিলেন ২৮ নভেম্বর। পরদিনই ফেরার কথা। কিন্তু সেদিন ও পরদিন না আসায় দুশ্চিন্তা করেছি। অনেকদিন পর বরিশাল এসেছি, আমাকে এখানে রেখে ঢাকায় অযথা কালক্ষেপ করার লোক তিনি নন। আমি যখন অধীর আগ্রহে তার অপেক্ষায় তখন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে, আমাদের সকল প্রাত্যহিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে। গত একমাসে তিনি নাকি অনেকের সঙ্গেই অযথা ঝগড়া-বিবাদ করেছেন। এটি নাকি মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ, জাগতিক মায়া কাটানোর পূর্বনির্ধারিত এক দুর্জ্ঞেয় বিধান।

১৯৫৪ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতার সময় গফুরের সঙ্গে পরিচয়। তিনি তখন বাবুগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আমার বাড়িওয়ালা নীহার চক্রবর্তী ওই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশিক্ষক ছিলেন এবং তার উদ্যোগেই সাক্ষাৎ। আমরা তখন টগবগে যুবক, মুহূর্তেই তিক্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম, বিষয়বস্তু আজ আর মনে নেই, হতে পারে রাজনীতি কিংবা শিক্ষাতত্ত্ব এবং ভেবেছিলাম ভবিষ্যতে আর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হবে না। কিন্তু ফল হল বিপরীত, পরের সপ্তাহে গফুর আবার এলেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যা আর কোনদিন ছিন্ন হয়নি।

গফুর ১৯৪৫ সালে মেট্রিক পাশ করেন। তিনি ছিলেন বরিশাল মুসলিম লীগের ছাত্র-ফ্রন্টের অন্যতম নেতা। কিভাবে তিনি বাম-রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন জানি না। মুসলিম লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে কমিউনিস্ট চিন্তাধারার অনেক মিল ছিল। এই পার্টি দুটি ব্রটিশ রাজত্বের শেষ পর্বে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিন একত্রে কাজকর্মও করেছে, গফুর তাতে প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, মহিউদ্দিন আহমেদ তাকে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করে থাকতেও পারেন। তারা দু'জন শেষপর্যন্ত আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও গফুর ন্যাপেই থেকে যান এবং ন্যাপ খণ্ডবিখণ্ড হলে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই শিক্ষক কলম ফেলে দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেন এবং বহু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নেতৃত্ব দেন। একাত্তরের জুন-জুলাইতে বরিশালে তার নেতৃত্বেই মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম সংগঠিত হতে থাকেন এবং ক্যাপ্টেন ওমর পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে বরিশালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর সঙ্গে থেকেই ১৪ ডিসেম্বর বরিশালের মুক্তিদিবস পর্যন্ত লড়াই করেছেন। তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন ওমরের একজন শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী। মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু জনযুদ্ধও আর গফুর রাজনৈতিক কর্মী বিধায় এক্ষেত্রে তার সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লেগেছিল। গফুরের কাছে যুদ্ধকালীন অনেক কাহিনী শুনেছি। এগুলোর দুটি আজও মনে গেঁথে আছে।

একবার দোয়ারিকার বাজারে নৌকার মাঝির ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শুনতে পেলেন লোকজন বলাবলি করছে আত্মগোপনকারী বরিশালের সদর গার্লস্কুলের এক শিক্ষিকাকে দু-একদিনের মধ্যে স্থানীয় দালালরা পাক বাহিনীর হাতে তুলে দেবে। বুঝতে পারলেন এই শিক্ষিকা আর কেউ নন বরিশালের বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী নিখিল সেনের স্ত্রী, সকলের প্রিয় পদ্মবৌদি। মুহূর্তেই তাঁকে উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিলেন। সামনে ফেরিঘাটে সামরিক প্রহরা। স্টেনগানটি নৌকার গলুইর নিচে লুকিয়ে সামরিক বাহিনীর তল্লাসির ঝুঁকি নিয়েই পেরিয়ে গেলেন ফেরিঘাট। অত্যন্ত সতর্কভাবে খোঁজ নিয়ে পৌঁছলেন যথাস্থানে। দুটি সন্তানসহ গর্ভবতী পদ্মবৌদির চরম দুরবস্থা দেখে চোখে জল এল। কিভাবে যেন একটি বোরকা জোগাড় করে তাকে সেটা পরিয়ে তখনই সবাইকে নিয়ে আবার নৌকায় উঠলেন এবং সেই বিপজ্জনক ফেরিঘাট পেরিয়ে তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিলেন।

আরেকদিন তাদের নৌবহর যা কিছু লঞ্চ ও নৌকার সমাহার, চলছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত। নিঃশব্দ চরাচর। গফুরের চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ সন্দেহ হল বহরটি ভুল পথে চলেছে। একটি লোক এই গভীর রাতে নদীতে বড়শি ফেলে বসেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানলেন সামনেই ঝালকাঠি, অর্থাৎ নৌবহরটিকে কেউ নিশ্চিত মরণফাঁদের দিকে চালিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু গতিপথ বদলের ক্ষমতা তার নেই। পারেন শুধু কমান্ডার, কিন্তু তিনি কোন্ নৌকায় আছেন সেটা টপ-সিক্রেট। গফুর সেই অসাধ্যসাধন করলেন। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সবকিছু বললেন এবং নৌবহর থামল। এভাবেই নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা পেল মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড।

আমি ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হই। গফুর ঢাকা এলে আমার সঙ্গে ঢাকা-হলে থাকতেন। তাকে এম. এ. পড়তে বলতাম। ভাল ছাত্র ছিলেন। একাধিক বৃত্তিও পেয়েছিলেন। সহজেই ডিগ্রিটা নিতে পারতেন। নেন নি। স্বাধীনতা লাভের পর বাবুগঞ্জ ছেড়ে বরিশাল বি. এম. স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে যোগদানের ব্যাপারেও আমার অমত ছিল। গফুর শোনেন নি। এম. এ. ডিগ্রি না থাকাটা তখন তার জন্য অসুবিধাজনক হয়েছিল। তাকে পরিচালনা সহজ ছিল না। আমার সঙ্গে বহুবার মতান্তর ঘটেছে, কিন্তু একবারও মনান্তর ঘটে নি। পঁচাত্তরের পরবর্তী ঘটনাবলির অভিঘাতে তিনি বি. এম. স্কুলের চাকরিটি খোয়ান। একাশি সালের শীতে মস্কো থেকে ছুটিতে বরিশাল ফিরে দেখি গফুর শিক্ষকসমিতির অফিসে আশ্রয় নিয়েছেন। স্ত্রীও তখন বরিশাল থেকে মাদারিপুর ডানোভান বালিকা বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে গেছেন। দেখে মনে হল বড়ই মনোকষ্টে ভুগছেন। রোজ ভোরে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বেলস্ পার্কে বেড়াতে যান এবং ভ্রমণশেষে ব্যাপটিস্ট মিশন বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পুনর্দান হালদারের বাসায় চা-পান ও গল্পগুজব চলে। বরিশালের চৈতন্য-গোবিন্দ বালক বিদ্যালয়ের তখন চরম দুরবস্থা। তাকে স্কুলটির দায়িত্ব নিতে বলি। জানতাম শিক্ষকতা ছাড়া আর কিছুই তাকে স্বস্তি দেবে না। এবার আমার কথাটি মান্য করেন এবং স্কুলটি তারই করস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হয়। এখান থেকেই গফুর অবসর গ্রহণ করেছিলেন। এতসব সত্ত্বেও গফুর কিন্তু বাবুগঞ্জের গফুর স্যারই থেকে গিয়েছিলেন। সেখানকার ছাত্ররাই ছিল তার গর্ব ও গৌরবের প্রধান আকর। মৃত্যুর আগে গফুর বাবুগঞ্জে স্বগ্রামে আরেকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেটির উন্নয়নে নিরন্তর আবিষ্ট থেকেছেন। পঁচাত্তরের পরবর্তী কয়েক বছর ছাড়া আর কখনই তাকে হতোদ্যোম দেখি নি। ভাবি, কর্মপ্রাণ বর্ণাঢ্য এমন একটি মানুষকে নিয়ে কোন মহৎ উপন্যাস রচিত হতে পারত আর আমার সেই ক্ষমতা নেই বলে বড়ই দুঃখ হয়।

গফুরের সংগঠন দক্ষতার অন্যতম দৃষ্টান্ত বরিশাল শিক্ষক সমিতির বর্তমান স্বাবলম্বী অবস্থান। বরিশাল ফরিকবাড়ি রোডে নির্মিত হয়েছে সমিতির বহুতল ভবন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে জায়গাটি কেনার আলোচনায় গফুর আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। বাড়ির মালিক প্রয়াত ডা. এম আহমদ ছিলেন প্রকৃতিপ্রাণ মানুষ এবং সেই সুবাদে আমার ঘনিষ্ঠজন। তাঁর ছেলেরা শিক্ষকসমিতির মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে বাড়িটি বিক্রি করতে সহজেই রাজি হন। আমি তখন একটি মৌখিক শর্ত বেঁধে দিয়েছিলাম — সমিতির হলরুমে থাকবে বরিশালের বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক ও প্রকৃতিপ্রেমী হিসেবে ডা. এম আহমদের একটি ছবি। শিক্ষক ভবন তৈরি হলেও শর্তটি পূরণ হয়নি জেনে গফুরকে চিঠি লিখেছি একাধিকবার। অক্টোবর মাসে আমার ঢাকার বাসায় এলে আবারও কথাটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিই। ডিসেম্বরে বরিশাল গেলে গফুর আমাকে জানান যে ছবিটি এসে গেছে এবং যথাসময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লাগান হবে এবং সেখানে আমাকেও কিছু বলতে হবে। আমি সানন্দে রাজি হই। ডা. এম আহমদের স্মৃতিচারণ আমার অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ। গফুরের মৃত্যুর পর

চৈতন্য-গবিন্দ স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক আশীষ দাসগুপ্ত আমাকে জানান যে ছবিটি গফুরের হাতেই লাগানোর কথা ছিল যা আর কোনদিন সম্ভব হবে না।

গত কয়েক মাসে গফুর আমার ঢাকার বাসায় কয়েক বারই এসেছেন, থেকেছেন। এটাও সেই মৃত্যুপূর্ব অমোঘ নিয়তির বিধান কিনা জানি না, তবে আমার সঙ্গে কোন ঝগড়া-বিবাদ হয়নি, এমনকি বিতর্কও নয়। শ্যামলী থেকে হেঁটে আসতেন, খুব ভোরে হেঁটে ফিরতেন। মর্নিংওয়াকের অভ্যাস তার অনেকদিনের। ঢাকায় এভাবে চলাফেরা করতে তাকে নিষেধ করতাম। জানতাম চোখে ছানি ধরেছে, শোনেন নি। আসলে বয়সের কাছে হার মানতে চাইতেন না। চিরকালের এই জেদী মানুষটি সত্তোরোর্ধ্বেও এতোটুকু বদলান নি। ভাবি অদম্য আত্মবিশ্বাসের জন্য হয়ত এম. এ. ডিগ্রিলাভে তাঁর অনাগ্রহ জন্মেছিল, থাকতে পারে নিজের বিস্তর পড়াশোনার ভূমিকাও। প্রচুর বই কিনতেন, পড়তেন। শেক্সপিওর ও রোলাঁ ছিলেন প্রিয়তম লেখক। চমৎকার বক্তৃতা করতেন। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন সর্বদাই আর তাতে লাঞ্ছিতও হয়েছেন এবং তা শুধু শত্রুপক্ষের কাছেই নয়, স্বপক্ষীয়দের দ্বারাও। আজ তাঁর অনুপস্থিতিতে বরিশালের অনেকেই সেসব কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন এবং তার স্থানাপন্ন হওয়ার মতো আর একটি মানুষও খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর মৃত্যু আমার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। বৃদ্ধ বয়সে বন্ধুহীন হওয়া এক চরম দুর্দৈব। সুখস্মৃতিভরপুর বরিশাল গফুরের মৃত্যুতে আমার জন্য প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

পরিশেষে অন্তিম শয়ানে গফুরের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ বিরচিত ও গৌরনদীর নাঠৈ রিজিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মণ্ডল প্রকাশিত একটি শোকগাথার কয়েক পঙক্তি *হানিফ সাহেব নেই ধরাধামে তাহারে স্মরণ করি/ বিপদ থেকে মুক্ত হলেন এই হস্তটি ধরি/ কিরূপে পেলেন আত্মরক্ষা অনুরূপা ভৌমিক/দারুণ ঘটনা সকলের জানা ছিল না অলৌকিক/ নওয়াজীস আলী খান সাহেব যাঁহার পরশে বড়/শ্রদ্ধার সাথে স্মরিতে তাঁহার বিকশিত অন্তর/ জুয়েল আইচ যিনি স্বনামধন্য অভিনব জাদুকর/তাকেও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন মহামতি এই নর/জীবন তাঁহার কেটেছে এভাবে বিদ্যালয়ের বাটে/লাঙ্গলধৃত পেয়েছি তাঁহাকে বি. এম. স্কুল মাঠে/... মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন মোদের গফুর ভাই/রক্তস্নাত দেশের সেবায় আবার তাঁহাকে পাই/ আজিও সে কায়া চোখভরা মায়া ছায়াসম সাথে সাথে/নবচেতনায় বিকশিত হয়ে নিতি নব মালা গাঁথে/সেই সে মুরতি চোখভরা জ্যোতি বুলেটবিদ্ধ হাত/ঊর্ধ্বে তুলিয়া শিক্ষাপ্রদীপ ধাবমান দিন রাত ॥*



যুদ্ধদিনের কথা

জিম ম্যাকিনলে 'যুদ্ধদিনের কথা' লিখে, বলা যায়, একটি অর্পিত দায়িত্বই আংশিক পূরণ করেছেন, যে দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তেছিল এদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিশেষ অবস্থানজনিত কারণে তথা তাঁর সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রকাশ্য ভূমিকার জন্যও। আংশিক বলছি এজন্য, কেননা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের আত্মবলি, সেবা ও ব্যাপক অবদানের এটি এক খণ্ডচিত্র মাত্র। একাত্তরের 'সংগ্রামের' দিনে এক পর্যায়ে মিশনারির সঙ্গে থাকার সুবাদে আমার পক্ষে এই কর্মকাণ্ডের কিছুটা জানা সম্ভব হয়েছিল। বইটির অনুবাদক মফিদুল হক 'পরাক্রমী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি, মানবিকতা ও কল্যাণবোধের' যে আদর্শ এই মার্কিন মিশনারির মধ্যে লক্ষ করেছেন তা কোনো ব্যতিক্রম নয়। চরম আত্মপরীক্ষার এই দিনগুলোতে এদেশের সকল মিশনারিই আক্রান্ত নিপীড়িত লাঞ্ছিত বাঙালির পাশে ছিলেন পরমাত্মীয়ের মতো। মিশনগুলো ছিল 'নিজভূমে পরবাসী' বাস্তুচ্যুত শত্রুতাড়িত অসহায় 'শরণার্থীদের' আশ্রয়কেন্দ্র। এই মিশনারিরা নিজ সরকারের নীতি বর্জন করে খ্রিস্টীয় ধর্মবোধ ও আর্তসেবার মহান আদর্শে পরিচালিত হয়ে হানাদার বাহিনীর বর্বর সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে অকুতোভয়ে আত্মদান করেছেন, চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছুটেছেন আক্রান্ত দগ্ধ গ্রামগুলোতে, বিপন্নের উদ্ধারে সম্ভাব্য সাহায্য দানে। একে 'লিবারেশন থিয়োলজি' ছাড়া আর কিই-বা বলা যায়।

একাত্তরের ২৯ মার্চ আমি নাগরী পৌঁছাই। টঙ্গীর অদূরস্থ খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকার কেন্দ্র এই নাগরী। তখন ইস্টার পরবের আয়োজন চলছে। ঢাকার বাইরে সারা দেশ স্বাধীন। পুবাইল ও আড়িখোলা স্টেশনের মাঝখানের রেললাইনটি তুলে ফেলে এলাকাটিকে দুর্গমতর করা হয়েছে। আকাশ-বাতাস 'জয়বাংলা' আর 'সোনার বাংলা' নিনাদে মুখরিত। নিত্যদিন সুখবর আসছে অমুক অমুক জেলা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সকলেই বিজয় সম্পর্কে আশাবাদী। বন্যার স্রোতের মতো মানুষ চলছে শহর ছেড়ে। নাগরী তাদের সাধ্যমতো সাহায্য দিচ্ছে। কখনো আসছে দলছুট সৈন্যরা হাতে বন্দুক, কাঁধে গুলির বেল্ট। কিশোররা পর্যন্ত সেগুলি হাতে নিয়ে পরখ করছে। কামানের আওয়াজ, বিস্ফোরণ, সেবার জেটের কর্কশ চিৎকার — সব মিলিয়ে দারুণ উত্তেজনা।

এপ্রিলের শেষ নাগাদ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। উল্লাস ও আশাবাদের বদলি হিসেবে পুঞ্জীভূত হতে থাকে ভয় ও আশঙ্কা। কামানের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে যায় দূর সীমান্তে। হানাদাররা সব জেলা শহর দখল করে নেয়। দিনগুলো দুঃসংবাদে ভরে ওঠে। জনযাত্রা

শুরু হয় উল্টোমুখী — গ্রাম থেকে শহরে। অনিশ্চয়তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে। এসময়ই একদিন আড়িখোলা স্টেশনের লাগোয়া বারিয়া গ্রামে পাকবাহিনী হামলা চালায়। গ্রাম পুড়ে যায়। অনেকে মারা পড়ে। জীবিতরা আশ্রয় নেয় নাগরীর মিশনে। এ থেকেই শুরু। প্রতিদিন নাগরীতে শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ে। ইতোমধ্যে রেললাইনটি বসে গেছে। সেনাবোঝাই ট্রেন চলে। শিকারের খোঁজে হানাদাররা গ্রামগঞ্জে হামলা শুরু করে। নতুন নতুন মৃত্যু সংবাদ আসে। বিলাপের রোল ওঠে। নাগরীতেও দুর্ভাবনার ছায়া নামে। কী করা এখন? শরণার্থীদের জন্য জায়গাটি পাকবাহিনীর লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে।

মিশনারি ফাদারদের উদ্যোগে স্থানীয় খ্রিস্টানদের সভা বসল এবং সেই প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তই গৃহীত হল আর্তকে, বিপন্ন প্রতিবেশীকে আশ্রয় দিতে হবে। নাগরী অঞ্চলের প্রতিটি খ্রিস্টানের গৃহদ্বার শরণার্থীর জন্য উন্মুক্ত হল, আপন আত্মীয়ের মতো তারা ঘরে তুললেন তাদের। আমার আশ্রয়দাত্রী পল রোজারিওর মা, নিঃস্ব রমণী, বহুকাল সযত্নে লুকিয়ে রাখা ক্রুশ-ঝুলান রুপোর একটি হার আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, যেন রক্ষাকবচ। নটরডেম কলেজের আমার সহকর্মী হেনেসী পিউরিফিকেশন কলেজ থেকে নিয়ে এলেন আমার জন্য একটি ভুয়ো পরিচয়পত্র (ডান্ডিকার্ড)। প্রতিবেশী টমাস সাহেব আমাকে সাহস দিয়ে তাঁর পাটক্ষেতটি দেখাতেন যেন আমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যই ওটি এতটা যত্নসহকারে বুনেছেন। আর আমার আস্তানায় প্রায়ই আসতেন নটরডেম কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ফাদার পিসিটো কাদাভরা পথে তাঁর সাইকেলটি টেনে টেনে, হাতে গুঁজে দিতেন বেতনের টাকা, কখনো পড়ার বই, শাপশাপান্ত করতেন পাকিস্তানিদের এবং এই মানুষী দুর্বলতার জন্য হয়ত ম্যাকিনলের মতোই শেষে প্রার্থনা করতেন 'ঈশ্বর আমাদের ঘৃণা ও আধিপত্য থেকে রক্ষা করুন। রক্ষা করুন যুদ্ধ থেকে যা মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে। আমাদের মনে সঞ্চার করুন সকল মানুষের জন্য ভালবাসা।'

মে মাসের শেষের দিকে নাগরীতে শরণার্থীর সংখ্যা বিশ হাজারে পৌঁছায়। আমি ততদিনে রেললাইনের লাগোয়া পল ও টমাস সাহেবের আশ্রয় ছেড়ে নাগরীর মিশনের কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় হেনেসির বাড়িতে থাকি। হেনেসিরা অনেক ভাইবোন। বিধবা মা একমাত্র হেনেসির সামান্য উপার্জন দিয়েই সংসার চালান। তবু তিনি আমাকে সাদরে তার অন্নের ভাগ দেন এবং ঘরের একমাত্র তক্তপোষটি আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভূমিতেই পুরো পরিবারের শয্যা পাতেন। হেনেসির দ্বিতীয় ঘরটি শরণার্থীরা 'দখল' করে নিয়েছিল। এমন অবস্থা তখন সর্বত্রই। অনেক শরণার্থী আবার খ্রিস্টানদের ভিটেয় নতুন ঘর বানিয়ে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছে। এমন দৃশ্য বহুবার দেখেছি যখন গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী পথে-বসা সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারকে ডেকে এনে ঘরে তুলেছেন, দূর গ্রামের ভিন্নধর্মী বিপন্ন বন্ধুদের 'উদ্ধার' করে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছেন। বাঙালি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আমার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আজ বলতে পারি তাদের সমষ্টিগত উদারতা ও মানবপ্রেম আমার স্মৃতিতে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

একটি দিনের কথা আজও মনে পড়ে। জুন মাস। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি ঝরছে। নাগরীর স্কুল, ছাত্রাবাস, দোকানপাট, মানুষে বোঝাই। কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। স্কুলের মাঠে হাজার খানেক পরিবার উদোম আকাশের নিচে ভিজছে, কারও মাথায় ছাতা, কারো-বা চটের টুকরা। এক অসহনীয় দৃশ্য। জয়দেবপুর স্কুলের জনৈক শিক্ষক, আমার

সদ্যপরিচিত, হঠাৎ ফিস ফিস করে বললেন, 'এখানে যারা ভিজছে ওদের কয়েক জনকে আমি চিনি। ওরা জয়দেবপুর সামরিক ছাউনির বাঙালি অফিসারদের পরিবার। স্বামীরা মারা গেছে কিংবা সীমান্ত পেরিয়েছে। আত্মীয়রা হয়ত ওদের আশ্রয় দেয় নি।' বৃষ্টির বেগ প্রবলতর হচ্ছিল। মাঠটি জলে ডুবে যাচ্ছিল। মিশনের ফাদারদের ছুটোছুটির অন্ত ছিল না। আজ ভাবতে ভাল লাগছে নাগরী আত্মীয়ত্যক্ত এইসব 'বিপজ্জনক' মানুষকেও সেদিন ফিরিয়ে দেয় নি।

প্রতিদিন হানাদারদের হামলা বাড়ছিল। একটি বৃহৎ জাল যেন ক্রমেই নাগরীর দিকে গুটিয়ে আনা হচ্ছিল। একদিন একটি হেলিকপ্টার কিছু প্রচারপত্র বিলি করে গেল 'দুশমনদের আশ্রয় দেবে না।' নাগরীর মিশনে তখন ফাদার পিসিটো কাজ করেন। আরও কয়েকজন ফাদার ছিলেন। নাম আজ মনে নেই। তাঁদের ওপর সেবাকার্যের চাপ, রাজনৈতিক চাপ বাড়ছিল। ইতোমধ্যে নিয়াজী ও ফরমান আলী ঢাকার বিশপকে ডেকে সতর্ক করে দিয়েছে। নাগরীর খ্রিস্টানরা মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলায় অবস্থা জটিলতর হয়ে উঠেছিল। তবু মিশনারিরা হতোদ্যম হন নি। বিপন্ন মানুষকে সাহায্যের জন্য তখনো ছুটছেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। একাধিকবার পাকবাহিনীর গুলির মুখে প্রাণ বাঁচিয়েছেন নৌকা থেকে জলে লাফিয়ে পড়ে।

আগস্ট মাসের দিকে নাগরী ছেড়ে আমি ভারতে চলে যাই। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিশনারিদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি বই লেখার জন্য নটরডেম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ফাদার (ড.) টিমকে অনুরোধ করি। আমার জানাশোনা মিশনারিদের মধ্যে পাণ্ডিত্য, সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। আজ যখন দেখছি অতীতের গৌরবদীপ্ত দিনগুলোকে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তজালে ঢেকে দেয়ার আয়োজন চলছে, হতাশা ও ব্যর্থতায় মলিন হয়ে উঠছে যুদ্ধদিনের উজ্জ্বল স্মৃতিগুলো তখন এই ভেবে দুঃখ হচ্ছে যে চেষ্টা করলে হয়তো ফাদার টিমকে দিয়ে এমন একটি বই লেখানো অসম্ভব হত না।

মুক্তিযুদ্ধের পনের বছর অতিক্রান্ত। আমি দশকাধিক কাল বিদেশে। তবু জিম ম্যাকিনলের লেখা 'যুদ্ধদিনের কথা' বইটি পড়ে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে, আমার জাতির এই বীরত্বগাথা আমাকে নতুন করে উজ্জীবিত করছে, বর্তমানে অন্ধকারের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে আশাবাদী করে তুলছে। বইটির জন্য জিম ম্যাকিনলে সকল বাঙালির ধন্যবাদার্হ হবেন। বিদেশীদের দেখার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ বিধায় আমাদের সমাজের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হওয়ার ফলেই এমনটি ঘটে। এগুলো বইটিকে বাড়তি ঐশ্বর্য দিয়েছে। মফিদুল হকের তর্জমা অত্যন্ত সাবলীল ও সুখপাঠ্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার শব্দচয়নে মিশনারিদের ব্যবহৃত বাংলা ব্যবহার লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, তাতে অনুবাদ সমৃদ্ধতর হয়েছে। মফিদুল হক আরেকটি কারণেও ধন্যবাদার্হ। তার মতো বামপন্থী গোষ্ঠির একজনের হাতে বইটি অনূদিত হওয়ার ফলে বিদেশী ও মিশনারি মাত্রেই যে আমাদের পক্ষে পরকীয় ও বর্জনীয় নন এই যুক্তিসঙ্গতি বাংলাদেশের রাজনীতির বামপন্থী মহলকে হয়ত-বা কিছুটা প্রভাবিত করবে।



মায়ের এ অশ্রুধারা

কল্পনা ও বাস্তব, তত্ত্ব ও প্রয়োগ এইসব অন্বিত প্রত্যয়ের ফারাক প্রাত্যহিক জীবনে মাঝেমধ্যে উপলব্ধ হলেও বৃহৎ সামাজিক আলোড়নের সময়ই তা সর্বাধিক ব্যাপ্তি ও গভীরতায় প্রকটিত হয়। কৈশোরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি ৩০৩ রাইফেল ছুঁয়ে দেখার সুযোগ ঘটেছিল এবং অতঃপর বহুকাল স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিলাম এমন একটি মারণাস্ত্রের মালিকানার আশায়, কতবার নিজেকে অমিত শক্তিধর কল্পনা করেছি, যেন অরণ্যে পর্বতে নিশিথে অকুতোভয় আমি, শুধু থাকা চাই বুকে-জড়ানো একটি রাইফেল, মানববিক্রমের জাদুকাঠি, প্রথম অস্ত্রধারী আদিমানবের নির্ভিকতার উত্তরাধিকার। কিন্তু একাত্তরের সংগ্রামের দিনে ৩০৩ রাইফেলের চেয়েও উজ্জ্বলতর অস্ত্র নাগালে এলে যন্ত্রটিকে এতই দুর্ভর মনে হয়েছিল যে, সেটা আর হাতে তুলে নেয়া গেল না। শেষাবধি রালফ ফ্যাক্স, কডওয়েল প্রমুখ মহাজনের পদাঙ্ক এড়িয়ে হলাম আমাদের কিশোর বয়সের বাইবেল 'পথের দাবী'র অনুজ্জ্বলতম চরিত্র শশী কবি, শব্দায়ুধধারী এক নগণ্য মসিযোদ্ধা। বড় হাস্যকর মনে হয়েছিল নিজেকে, বড় নির্মমভাবে মুখব্যাদান করেছিল কল্পনা ও বাস্তবের ফারাক।

ক্ষুদিরামের মায়ের কথা আমরা জানি না। আমাদের এই প্রথম শহীদ হয়ত-বা এতিম ছিলেন। শহীদের মায়ের ভাবমূর্তিটি আমাদের কাছে সর্বদাই বীরপ্রসবিনী বীরাঙ্গনার। সাহিত্যসৃষ্ট এই ধারণাটিই আমরা সম্ভ্রমে লালন করে এসেছি। কিন্তু শহীদের মায়ের সত্যিকার মুখচ্ছবি একাত্তরের আগে আমাদের অচেনাই ছিল। এখানেও সেই অনিবার্য ফারাক। দেখলাম, সন্তানের আত্মত্যাগে তার গৌরবদীপ্ত মুখের আদলটি আমাদের নিছক কল্পনা। এইসব মুখ আসলে নিরক্ত, বিবর্ণ, অন্তর্গত অগ্নিদাহে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। আমার মা বলতেন, সন্তানের মৃত্যুতে নাকি জননীর অদৃশ্য অঙ্গহানি ঘটে, হৃৎপিণ্ডের একটি টুকরো খসে যায়। শহীদের মা এই অর্থে এক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাও। এই এক দশক ধরে আমি এমন নেতিবাচক ধারণাই লালন করছিলাম। কিন্তু জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়ার পর আমার চোখে শহীদদের জননীর মুখগুলোর আদল বদলে গেছে, তাদের যাবতীয় বিষণ্নতার আড়ালে ইতিহাসের নির্মম নিয়তিকে সহ্য করার মতো এক প্রবল প্রাণশক্তির আভাস ফুটে উঠেছে, লেনিনগ্রাদের চারলাখ শহীদের সমাধিস্থল পিসকারেভের মাতৃমূর্তির ললিতে কঠোরে মেশান অনুপম ভাস্কর্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'জাহানারা ইমাম, এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মা, এক সংগ্রামী দেশপ্রেমিকের স্ত্রী, এক

দৃঢ়চেতা বাঙালি নারী, হৃদয়কে পাথর করে, বুকের গহীনে বহন করা বেদনাকে সংহত করে দুঃখের নিবিড় অতলে ডুব দিয়ে বিন্দু বিন্দু মুক্তোর মত চরম শোক ও পরম গৌরবমণ্ডিত একাত্তরের দিনগুলোর নির্যাস আমাদের হাতে তুলে দিয়ে সকল শহীদের আত্মীয়দের প্রতিনিধি হিসেবে একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং বঙ্গনারীর অমিত শক্তি সম্পর্কে আমাদের নতুন দৃষ্টি দিয়েছেন।'

'একাত্তরের দিনগুলি'র শৈল্পিক গুণাগুণ বিচার ধৃষ্টতার সামিল হবে, কেননা, বইটি জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাসির মঞ্চ থেকে', 'অ্যানি ফ্রাংকয়ের ডায়েরি', লাইপম্যানের 'অগ্নিগর্ভ' কিংবা 'রোজেন-বার্গের পত্রগুচ্ছ'র মতোই পবিত্র পঙক্তিমালা। এবং বাঙালিদের জন্য অবশ্যই সার্থকতার বিষয়টি অন্যতর একটি কারণেও অপ্রাসঙ্গিক, কেননা গণবিপ্লবের পরিমণ্ডল আপন ধর্মেই স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যস্রষ্টা।

একজন নিরক্ষর বাঙালির একাত্তরের দিনগুলির স্মৃতিচারণ ক্যাসেটধৃত হলে, আমার ধারণা, তাও সাহিত্য হয়ে উঠবে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মতো পরিব্যাপ্ত ও ঘনীভূত ঘটনায়, যেখানে সমাজদেহের জ্যামিতিই বদলে যায়, সঞ্চিত শক্তির উৎসরূপী সমাজতলটি ওপরে উঠে আসে। মঞ্চে দেখা দেয় অচেনা মানুষের দল, তারা লড়াই করে, নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে যা কম জাতির ভাগ্যেই ঘটে। এখানে লেখার সাফল্য অবধারিত, প্রয়োজন বিশ্বস্ততা ও সাহসের, অন্যথা পেশাদার লেখিকা না হয়েও জাহানারা ইমামের পক্ষে এমন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হত না। মুক্তিযুদ্ধই আসলে এই লেখিকার স্রষ্টা।

কাহিনীটির শুরু একাত্তরের ১ মার্চে। ঢাকা শহরের এলিফ্যান্ট রোডের একটি সুখী সংসার, স্বামী-স্ত্রী, দুটি সন্তান। বড় ছেলে রুমী সবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে, ওদিকে মার্কিন দেশের একটি নামী প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউটে যাওয়ার দিনক্ষণও স্থির। রুমী মার্কস, এঙ্গেলস, মাও ভক্ত। সুকান্ত জীবনানন্দ মুখে মুখে। সে মুক্তবুদ্ধি দেশপ্রেমিক বাঙালি যুবকের প্রত্নমূর্তি। কিন্তু ২৫ মার্চের ঘটনা তার জীবনের গতিধারা পাল্টে দেয়। মার্কিন মুলুকে পড়াশোনার রঙিন সুযোগটি তুচ্ছ করে সে গেল আগরতলার মেলাঘর। হল গেরিলা। আগস্ট মাসে ঢাকায় ফিরল এবং যথারীতি নানা অপারেশন। এগুলিরই একটি
"গিয়ে দেখি রুমীর চেহারার অবস্থা করুণ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল, রাতজাগা লাল চোখ, কুঁচকানো কাপড়চোপড়। রুমী বলল, 'এই চেহারা সুরত নিয়ে বেবীতে যেতে সাহস পেলাম না। গুলশান লেকের ঘাট থেকে মিনি মামার বাসাটা একদম কাছে, তাই এদিকে এলাম।' বুঝলাম নদীর ওপারে যে-গ্রামে ওদের ক্যাম্প আছে সেখান থেকেই এসেছে। বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। অসুবিধা তো কিছু নেই আমার। কিন্তু চেহারা সুরত এ রকম হল কি করে বলা যাবে?' যাবে' বলে রুমী বিষণ্ন হাসি হাসল। পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখবুজে আস্তে আস্তে বলল, 'পরশু রাতে দুটো নৌকায় করে আমরা কয়েকজন, সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের আশপাশটা একটু দেখতে বেরিয়েছিলাম। সামনের নৌকায় কাজী ভাই, বদি আর জুয়েল ছিল। অন্ধকার রাত, কিছু দেখা যায় না। আমরা পেছনের নৌকায়, একটু দূরে। আসলে কাজী ভাইরা কি যেন একটা চেক করে দেখার জন্য এগিয়ে গেছে, আমাদের একটু পেছনে থাকতে বলেছে।

হঠাৎ শুনি ভয়ানক গুলির শব্দ। কিছুই বুঝতে পারি না। অন্ধকারে শুনলাম চিৎকার, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। একটু পরে কাজী ভাইদের নৌকা কাছে এলে সব জানতে পারলাম। কাজী ভাইরা একটা মিলিটারি ভর্তি নৌকার সামনে পড়েছিল। মাঝিটা ছিল রাজাকার। সে বাঙলায় শুধিয়েছিল 'কে যায়', মিলিটারিগুলি একদম চুপ করে ছিল। কাজী ভাই একটু ঘুরিয়ে জবাব দেয় 'সামনে'। নৌকাটি একদম কাছে আসতেই ওরা দেখে নৌকা ভর্তি মিলিটারি। কাজী আর জুয়েল তাদের স্টেনগান নৌকার পাটাতনে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বদি তা রাখে নি। সে কোলের মধ্যে রেখেছিল। ভাগ্যিস রেখেছিল। তাই আমরা সবাই বেঁচে গেছি। বদি সঙ্গে সঙ্গে স্টেন তুলে ওদের নৌকার ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। পুরো ম্যাগজিন একেবারে খালি করে দেয়। মিলিটারিরাও গুলি চালিয়েছিল তবে বদির ব্রাশের মুখে একদম সুবিধে করতে পারেনি। কেবল জুয়েলের আঙ্গুলে গুলি লেগেছিল। মিলিটারিদের কয়েকটা মরে, বাকিরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদর নৌকাটা উল্টে যায়। বদিও পানিতে পড়ে গিয়েছিল। ওকে পরে তুলে আমরা সবাই পিরুলিয়া গ্রামে ফিরে যাই। জুয়েলকে নিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম। সে রাতে কোনমতে ফার্স্ট এইড দিয়ে রাখা হল। গতকাল কাজী ও বদি জুয়েলকে ঢাকা নিয়ে এসেছে। ওর আঙ্গুলে অপারেশন করতে হবে।' আমার গা শিরশির করতে লাগল। একটু হলেই সবাই গুলি খেয়ে মরতে পারত, জখম হয়ে নদীর পানিতে তলিয়ে যেতে পারত। কোন দিন জানতেও পারতাম না ছেলেগুলোর কি হল। রুমীকে সে কথা বলতে সে হাসল, 'আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফ কি বলেন জান? তিনি বলেন, 'কোন স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না, চায় রক্তস্নাত শহীদ।' অতএব মামণি, আমরা সবাই শহীদ হয়ে যাব – এই কথা ভেবে মনকে তৈরি করেই এসেছি।' আমার হঠাৎ দু'চোখে পানি এসে গেল।"

২৯ আগস্ট রুমী ধরা পড়ে। তার বন্ধুরাও। রুমীর বাবা শরীফ ও ছোট ভাই জামীকেও ওরা ধরে নিয়ে যায়। ৩১ আগস্ট শরীফ জামীকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু রুমী আর কোনদিন ফেরে নি। শরীফ মারা যান ১৩ ডিসেম্বর স্ট্রোকে। ১৭ ডিসেম্বর কাহিনী শেষ।

দিনলিপি হিসেবে লেখা বইটি একবার পড়তে শুরু করলে পাতা থেকে চোখ সরান যায় না, লেখিকার বাড়িতে পাঠকের যাতায়াত শুরু হয়ে যায়, চেনা হয়ে যায় বাড়ির প্রতিটি ঘর, লোকজন, বন্ধুবান্ধব, তার উদ্বেগ আতঙ্ক ও দুঃখবেদনা সংক্রমিত হতে থাকে আমাদের মনে এবং প্রকাশকের ভাষায় 'তার ব্যক্তিগত শোকস্মৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় আমাদের সকলের টুকরো টুকরো অগণিত দুঃবোধের অভিজ্ঞতার সঙ্গে। তার আপনজনের গৌরবগাথা যুক্ত হয়ে যায় জাতির হাজার বীরগাথার সঙ্গে, রুমী বুঝি কোন অলক্ষে হয়ে যায় আমাদের আদরের সকলের ভাইটি, সজ্জন ব্যক্তিত্ব শরীফ প্রতীক হয়ে পড়েন রাশভারী স্নেহপ্রবণ পিতৃরূপে এবং লেখিকা হন 'মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও জীবিত গেরিলার' মাতৃমূর্তি।

একাত্তরের পর আজ দশকাধিককাল অতিক্রান্ত। এখনো বীরের রক্তস্রোত ও মায়ের অশ্রুধারা বহমান। স্বর্গ তো এখনো কেনা হল না। কিন্তু সে অন্য কথা, অন্যতর প্রসঙ্গ।



এক অগ্নিকন্যার একাত্তর

খুরশীদ জাহান, আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে, আপনার লেখা ‘একজন মুক্তিযোদ্ধার কিছু স্মৃতিচারণ ও আত্মোপলব্ধি’ বইটি একদিন পেয়ে যাই ঢাকার সেগুনবাগিচার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। শেলফের এক কোণে পড়েছিল, আকার-আয়তন নজরকাড়া নয়, কিন্তু প্রচ্ছদে শিশুকোলে বন্দুকধারী এক নারীর ছবি দেখে আকৃষ্ট হই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টাই, চোখ তুলতে পারি না, একাত্তর কথা বলে ওঠে। বইটি কিনে বাড়ি ফিরি এবং একনাগাড়ে পড়ে শেষ করি। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি এ তো তাদের সেই অন্তহীন অবিনাশী কথামালার আরেক পাতা, শোকগাথাও বলা যায়, রাত্রির তপস্যা তো দিন আনলো না, সব ঋণ তো শোধ হলো না আজও। লেখাটি তৈরির সময় আমি বাড়িতে একা, টেলিফোন বন্ধ রেখেছি, দরজায় তালা এঁটেছি, কেননা এই পবিত্র পঙক্তিমালা রচনায় ধ্যানস্থ হতে হয়, শুদ্ধ হতে হয়।

পঁচিশে মার্চের পর একটি শিশুসন্তান নিয়ে আপনি যে দুঃখভোগ করেছেন, আত্মীয়দের কাছ থেকে নির্মম অসহযোগিতা ও দুর্ব্যবহার পেয়েছেন, ততোধিক কষ্টভোগী মানুষের সংখ্যা এদেশে অগণিত, তবু আপনার সঙ্গে তুলনায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমার স্ত্রী, একটি কলেজের শিক্ষিকা, এক মাসের কন্যা এবং ন’ বছরের ছেলে নিয়ে ফেব্রুয়ারির শুরুতে বরিশাল পিত্রালয়ে চলে যান আর আমি একা থেকে যাই ঢাকায় আমার কর্মস্থলে, ফলে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম গণহত্যা দেখি, যে-দুর্দৈবের অণুমাত্র সম্ভাবনাও ইতিপূর্বে আঁচ করতে পারিনি। ২৯ মার্চ শহর ছেড়ে পলায়মান জনস্রোতে ভেসে পৌঁছাই পূবাইল রেলস্টেশনের লাগোয়া খ্রিস্টান-অধ্যুষিত নাগরীতে, জুলাই মাসের শেষপর্যন্ত ওখানেই থাকি, নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট, তারপর আগরতলা হয়ে কলকাতা। আমার স্ত্রী তার মা-বাবা ও ভাইদের সঙ্গে এপ্রিল মাসে বরিশাল শহর ছেড়ে চলে যান বাখরগঞ্জে গ্রামের বাড়ি, কিছু দিন ভালোই ছিলেন, আগস্ট মাসে শ্বশুর শহরে এলে পাকসেনারা তাঁকে হত্যা করে, ছেলেরা চলে যায় মুক্তিযুদ্ধে, শাশুড়ি তাঁর কন্যা ও নাতি-নাতনি নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে ঘুরে থিতু হন পটুয়াখালীর কাছে পায়রা নদীর পারে তাদের পারিবারিক বন্ধুগৃহে। আমার স্ত্রীর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন তা আর সম্ভব হয়নি। যুদ্ধশেষে তাকে তার অভিজ্ঞতার কথা লিখতে বলেছিলাম। লিখেন নি। তার দুই

বান্ধবী, একজন খ্রিস্টান, ছিলেন ঢাকাতেই, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাজও করেছেন, অন্যজন মুসলমান, চলে যান কলকাতায়, তাদেরও একই কথা বলেছিলাম, ফলোদয় ঘটেনি। পুরুষের সাথে নারীর অন্তর্গত কিছু ভিন্নতার জন্যই কি এমনটি ঘটে? কতসব কথা ও অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল তাদের, এগুলো অজানাই রয়ে গেল আমাদের। আপনি সম্ভবত ব্যতিক্রম। অস্ত্র হাতে নিয়েও সত্যিকার যুদ্ধে যেতে না পারার ক্ষোভই হয়তো শেষ পর্যন্ত আপনাকে কলম ধরতে বাধ্য করেছে এবং বলতে দ্বিধা নেই, এই যুদ্ধে আপনি জয়ী হয়েছেন। একাত্তর আপনাকে যোদ্ধা ও লেখক বানিয়েছে।

একাত্তর সালে আপনি কলেজ ছাত্রী, ছাত্র-ইউনিয়নের আঞ্চলিক নেত্রী, আপনার স্বামী একটি বামপন্থি রাজনৈতিক দেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ইতোমধ্যে পাক-আর্মিতে চাকরিরত বড় ভাই ছুটিতে বাড়ি এসেছে, যে ফিরে যেতে নারাজ, যাবে, মুক্তিযুদ্ধে। সকলে ভালোই ছিলেন। কিন্তু এপ্রিলের মাঝামাঝি বাগেরহাটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আসায় সেই সুখের সংসার তছনছ হয়ে গেল। স্বামী সেই যে উধাও হলেন আর ফিরলেন না। ভাইটি ভারতে যাবেন না, তাই স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর খোঁজে নিরুদ্দেশ। শান্তিকমিটি ও রাজাকারের দল গড়ে উঠল। খোঁজ পড়ল এই পরিবারের 'দেশদ্রোহীদের'। দিনে ঘরে থাকা অসম্ভব হওয়ায় আপনি ছোটবোন নাজলি ও দুধের শিশু তাজকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন বাড়ির পেছনের সুপারি বাগানের পাহারাদারের ছেড়ে-যাওয়া আধভাঙা কুঁড়েতে। শিশুর দুধের জন্য মা গরম পানি ও আপনাদের খাবার যোগান দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারলেন না। আপনার ভাষায়, 'ভোর না হতেই আমরা দু'বোন বাচ্চা কোলে বেরিয়ে পড়ি

কখনও কোনদিন গভীর জঙ্গলে, কোন ভাঙ্গা পুরানো কবরের ভেতর, কখনও পরিত্যক্ত কোন বাড়ি, পুরানো ইটখোলা। এক জায়গায় কিছুক্ষণ বসি তো হঠাৎ করেই কোন শব্দ শুনে ছুটি অন্যখানে ভূতের ভয়ে, সাপের ভয়ে যেসব জায়গায় যেতাম না এখন সেগুলোই আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। সবকিছু থেকে বেশি ভয় সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনা অথবা তাদের এদেশী দোসর রাজাকারকে। পরিত্যক্ত কোন ইটখোলার ভেতর বসে আছি, হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। রবারক্লথ ও কাঁথা দিয়ে তাজকে পেঁচিয়ে দু'দিক থেকে দু'বোন ছাতার মতো তাকে আগলে আমরা ভিজতে থাকি। মাটির ভেতর থেকে কিলবিল করে কেঁচো, জোঁক উঠতে থাকে। জোঁক গায়ে উঠে রক্ত চোষে, খেয়ালও করতে পারি না পাঁচিলের ভেতর থেকে কাঁকড়াবিছে বেরিয়ে হাত বা পায়ে কামড় বসায়, অসহ্য যন্ত্রণায় শেষে মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরিয়ে যেতে পারে সেই ভয়ে দু'হাতে মুখ চেপে ধরে ছটফট করতে থাকি আর সমানে দু'চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। কখনও কোন ঝোপে বসে আছি, পাশ দিয়ে সাঁই সাঁই বেগে বিষধর সাপ ছুটে যাচ্ছে। একটু দূরে গিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখে আবার ছুটে যাচ্ছে, যেন আমরা বিপদগ্রস্ত তা বুঝতে পারছে… একেকদিন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই খেয়েছি… পিপাসায় পুকুর, ডোবা বা নালার পানি দু'হাতে তুলে খেয়েছি দিনের পর দিন গোসল না করে, জামা-কাপড় না বদলে বনেজঙ্গলে কাদা-পানিতে বসে গায়ে পচা গন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

কিন্তু শেষপর্যন্ত বাড়ির আশপাশে আর থাকা সম্ভব হলো না। দূরের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আশ্রয়ের খোঁজে বের হলেন, কিন্তু বৃথা। আপনাদের রাজনৈতিক পরিবারই বড় বাধা হয়ে ওঠে। কেউই স্বাগত জানান না। কেউ দরজা থেকেই বিদায় দেন, কেউ শুধু রাতটা। দু'বোন লজ্জায় সমানে কেঁদেছেন শুধু। এইসব যাত্রায় কতবার বিপদে পড়েছেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, বেঁচে গেছেন দৈবক্রমে। যেটুকু সহায়তা ও সহমর্মিতা পেয়েছেন প্রায় সবই রিকশাওয়ালা ও ফরাজীর মতো নৌকার মাঝিদের কাছ থেকে। এটাও শহরে মধ্যবিত্তদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা, অথচ আমরা কেউ তাদের মনে রাখিনি, স্বাধীনতার পর তাদের আর খোঁজ করিনি, নিজেদের ভাগ্য-উন্নয়নের সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত থেকেছি।

যাহোক ওই ফরাজীই বিরাট ঝুঁকি নিয়ে সৈনিক ভাই ও শিশুসন্তানসহ আপনাদেরকে সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেয় যেখানে আপনার স্বামী রয়েছেন। স্বামীসাক্ষাতের কোনো রোমান্টিক বর্ণনা বইতে নেই। সময়টা ছিল ভাবালুতার অনুপযোগী আর সেখানে এই সাক্ষাৎও ঘটে অনেক দিন পর। তিনি ছিলেন অন্যত্র কর্মব্যস্ত। পৌঁছেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করেন, ছোট-বড় নানা মারণাস্ত্র চালানো শিখে নেন দ্রুত, কিন্তু কোনো অপারেশনে আপনাকে নেয়া হয় না, সিও জিয়াউদ্দিন শুধু অপেক্ষার আশ্বাস দেন। অনেক দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায় : কাপড় সেলাই, মশারি বানানো, শত শত রুটি তৈরি, রোগী ও আহতদের দেখাশোনা। প্রথম কাজগুলো করতে গিয়ে আঙুলের আগা ও হাতের তালুতে ঘা তৈরি হয়ে যায়, রক্ত ঝরে, কিন্তু কাজের বিরতি নেই। এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সালাম দেখাশোনা করত তাজকে। ছেলেকে যত্নআত্তি করতে আপনার সময় জুটত খুবই কম।

এই কাহিনী দীর্ঘ। ইচ্ছা থাকলেও বিস্তৃত বয়ানের সুযোগ নেই। তবু একদিনের কথা একটু বলি। বিমান হামলা শুরু হয়েছে। তাজকে কোলে নিয়ে লুকিয়ে আছেন খালপারের গর্তে। কাদায় শরীরের অনেকটা পোঁতা। আসাদ নামের আরেক তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গে। সে আছে কাছের একটি গাছের গুঁড়িতে সেঁধে। হামলা আর শেষ হয় না। অবিরাম ঝরছে বোমা আর গুলি। বনজঙ্গল তছনছ হচ্ছে। হঠাৎ করেই তাজ কান্না শুরু করল। ক্ষিদে পেয়েছে। অগত্যা আসাদ মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ডিঙ্গি থেকে বোতলটি তুলে আনল। এক সময় জোয়ার এলো। গর্তে পানি ঢুকে আপনাকে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল। কত কিছু গায়ে এসে জড়াচ্ছে, হতে পারে সাপ, যা আছে সুন্দরবনের সর্বত্র, এমনকি পৃথিবীর দীর্ঘতম অতিবিষধর শঙ্কচূড়ও। আপনি চিৎকার দিতে থাকেন ভয়ে। তাজ মাথার উপর তোলা। আসাদ ছুটে এসে আপনার গা থেকে ময়লা সরাতে গিয়ে টেনে আনে একটি লতা। সেই আসাদ যখন মারা গেল এক অপারেশনে, আপনি কেঁদেছেন ভাইহারা বোনের মতো। জানতেন হয়তো মুক্তিযুদ্ধ শহীদ চায়, জীবন্ত যোদ্ধা নয়। তবু মানুষ মানুষই। তাই লিখেছেন, 'ওকে হারিয়ে সন্তান হারানোর শোক পেলাম।'

ষোল ডিসেম্বরের পর আপনারা সুন্দরবনের বাইরে আফালবাড়ি চলে আসেন, উঠলেন ফরেস্ট বাংলোয়। রাজাকারদের দলে দলে দড়ি বেঁধে জমা করা হচ্ছে আশেপাশে।

আপনার ওপর সিও'র কঠোর নির্দেশ ঘর থেকে বের না হওয়ার। দেশ এখনও সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত নয়, আপনাদের জিম্মি করে ওরা সাঙ্গাতদের মুক্তি দাবি করতে পারে। ঘরে বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেলে একদিন বারান্দায় এসে দেখেন এক কোণে কয়েকজন বোরকাপরা মহিলা বসে বসে কাঁদছেন। হঠাৎ করেই এদের মধ্য থেকে দু'জন ছুটে এসে আপনার পা জড়িয়ে ধরলেন। একজন ফরাজীর বোন জানু, অন্যজন রবির মা, ফরাজীর বোনের জা। মনে পড়ল, সুন্দরবন যাওয়ার পথে ওদের বাড়ি এক রাত থাকার সময় সেইসব দিনের পক্ষে অভাবিত যত্নআত্তির কথা। মনে পড়েছে কিশোর রবির কথাও, যে আপনাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ছ'বোনের পর এক ভাই বলে তাকে যেতে দেয়া হয় নি। রবির মামা ছিল রাজাকার কমান্ডার। রমজানের সময় একদিন শেষরাতে রবি ও তার বাবাকে সে ধরে নিয়ে গুলি করে নদীর পাড়ে ফেলে রেখে যায়। এতে রাজনীতির বদলে ছিল বিষয়-আশয় নিয়ে শত্রুতা। সেই লোক এখন ধরা পড়েছে, তাকে বাঁচাতে হবে। 'পোলা স্বামী গ্যাছে, এখন ভাইটাও গেলে বাঁচমু কী লইয়া?' আপনি দোনামনা হয়ে তাদের আশ্বাস দেন। সিও খবরটি পান এবং আপনার ঘরে তালা পড়ে যাতে আর বাইরে বেরোতে না পারেন। আপনার কথা এখানেই শেষ করতে চাই।

কিন্তু আপনার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা না জানালে লেখাটা অসম্পূর্ণ থাকবে যিনি এতসব ধকল সয়েও কখনোই নত হন নি। আপনাকে নিয়ে ঘটে যাওয়ার কথা বাদই দিলাম, পাড়ার অসহায় হিন্দুদের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, ঠাকুরবাড়ির দেবীমূর্তির একসিন্ধুক স্বর্ণালঙ্কার এবং সবশেষে ওই লোকগুলোর জীবনও রক্ষা করেছেন। আপনাদেরকে সুন্দরবন যাত্রায় নৌকায় তুলে দিয়ে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা পুত্রবধূদের দূর বিলাঞ্চলের অনিশ্চিত গন্তব্যে পাঠানোর সময় আমার মায়ের উক্তির অবিকল উচ্চারণ, পার্থক্য শুধু দুটি শব্দের — আল্লাহ ও ঈশ্বর। তাঁর হাতে সমর্পণ ছাড়া এই দুই বৃদ্ধার আর কিছুই করার ছিল না। এই নারীরা বাংলার চিরন্তন মাতৃমূর্তির প্রতীক, তাঁদের কালের সামাজিক বাস্তবতার সৃষ্টি, যেখানে পরিবারে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রয়োজন হতো দার্ঢ্য ও আত্মত্যাগ। আজকের সমাজে তাঁদের আর বেশিদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। একান্নবর্তী পরিবার এখন ভেঙে গেছে, নারীরও রূপবদল ঘটেছে, কাউকে অবমূল্যায়ন করছি না, তবু আমার মায়ের প্রজন্মকে হারানোর দুঃখ ভুলতে পারি না। মা পঞ্চাশেও শ্বশুরের ভিটে ছাড়েন নি, একাত্তরেও না। মানুষের ওপর তাঁর অটল আস্থা ছিল, তিনি নিরাশ হন নি। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার এ যুগে একাত্তরের মতো কোনো দুর্বিপাকে এখনকার নারীর ভূমিকা কেমন হবে, কল্পনা করে ভরসা পাই না।

আপনার কাহিনীর শেষ অধ্যায় সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই। শুধু এইটুকুই পুনরাবৃত্তি করতে পারি যে, সহিংস সশস্ত্র বিপ্লব শেষাবধি তার সন্তানদেরই গ্রাস করে আর আমাদের ক্ষেত্রেও অন্যথা ঘটেনি। যতদিন মানুষ সম্পূর্ণ অহিংস হতে না পারবে ততদিন এমন দুর্দৈব থেকে মুক্তি নেই। বইটি লেখার জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।



প্রেম ও মৃত্যুর রূপকথা

'আমার কাছে এ হল পৃথিবীর আশ্চর্যতম, বিষণ্নতম নিসর্গদৃশ্য…এখানেই ছোট রাজকুমারের উদয় ও অন্তর্ধান। কোনদিন হয়ত আফ্রিকার মরুভূমি সফরে যাবে সেকথা ভেবে বলছি, জায়গাটা যাতে চিনতে পারো সেজন্য ছবিটা ভাল করে দেখে রাখো। যদি ওখানটায় এসেই-পড়ো, দোহাই, তাড়াহুড়ো করো না, ঠিক তারাটির নিচে ক্ষণিক দাঁড়াবে। তারপর যদি একটি ছোট মানুষকে দেখতে পাও, যার মুখে হাসি, চুলগুলো সোনালি রঙের, যে কোন প্রশ্নেরই জবাব দেয় না, তা হলে জানবে তিনিই সেই। সত্যি এমনটি ঘটলে আমাকে অবশ্যই একটি অনুগ্রহ করবে। তিনি যে ফিরেছেন শুধু এটুকু লিখে জানাবে।' জায়গাটা আমরা জানি, লিবিয়ার মরুভূমির তেপান্তরে, যেখানে বিধ্বস্ত বিমান নিয়ে নামলে ভিনগ্রহের বাসিন্দা ছোট রাজকুমারের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ ঘটে। রাজকুমার তাকে পোষ মানান এবং পোষ মানার যা অনিবার্য নিয়তি শেষ পর্যন্ত তাই ঘটে। বিচ্ছেদ ও রোদন আর সেই অদ্ভুত মুগ্ধকর কাহিনী শুনিয়ে এক্সুপেরি পোষ মানিয়েছেন বিশ্ববাসীকে, যেজন্য আমি একটি প্রান্তিক দেশের এক নগণ্য নাগরিকও বইটি পড়ার পর থেকেই একটি প্রব্রজ্যার স্বপ্ন দেখছি একদিন যাব লিবিয়ার মরুভূমিতে ছোট রাজকুমারের অন্তর্ধানের ওই জায়গাটিতে। তবে প্রথমে আরও উত্তরে মরক্কোর লাগোয়া সাহারার গহনে একটি পরিত্যক্ত বিমানঘাটিতে যেখান থেকে এক্সুপেরি ১৯৪৪ সালের ৩১ জুলাই একটি পর্যবেক্ষণ বিমান নিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি। আমি ওখানটায় দাঁড়াব মরুরাত্রির উজ্জ্বল তারাভরা আকাশের নিচে, খুঁজব সেই তারাটিকে, কেন না প্রত্যেক মানুষেরই একটি তারা আছে, আর সেটা না পেলেও জানব ওই তারাগুলোর কোন একটিতে তিনি আছেন, হাসছেন, মনে হবে যেন-বা সকল তারাই হাসছে এবং কেবল আমি, আমিই সেই হাসিভরা তারাগুলো দেখব আর কেউ না। কিন্তু জীবনের উপান্তে পৌঁছেও সেই স্বপ্নসাধ পূর্ণ হয় নি, তবে বইটি সর্বদাই কাছে রাখি এবং মৃত্যুচিন্তাতাড়িত হলে কখনো কখনো পড়ি, রাজকুমারের সেই আশ্বাসে যেন-বা প্রতীতিও জন্মে 'এটা হবে পুরনো পরিত্যক্ত খোলের মতো, পুরনো খোলের জন্য দুঃখ পাওয়ার কোন মানে হয় না' ('বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরো পরণি/তথা শরীরাণি বিহায় জির্ণান্য, ন্যানি সংযতি নাবানি দেহী,' অর্থাৎ যেমন জীর্ণ বসন পরিত্যাগপূর্বক মানুষ নতুন বসন পরিধান করে তেমনি জীর্ণ শরীর পরিত্যাগপূর্বক আত্মা নবরূপ পরিগ্রহ করে) এবং মায়ের মুখ থেকে শোনা — জীবাত্মা আলোর পথ ধরে আপন তারায় পৌঁছায়,

'যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি।' অথচ মধ্য-যৌবনের আগে বইটি পড়ার সুযোগ ঘটে নি, আমার অভিভাবক বা শিক্ষকরা এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি, সম্ভবত ৫নং পৃষ্ঠাটি পুরো না পড়েই ভেবেছেন এটি বড়দের জন্য উৎসর্গিত এবং ১নং ছবিতে টুপি আঁকার ব্যর্থ চেষ্টা আঁচ করে পরিবর্তে আমার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, পাটিগণিত ও ব্যাকরণ পাঠ অধিকতর উপকারী ঠাওরেছেন। ছেলেবেলায় বইটি না পড়ার দুঃখ ভুলতে পারি না, কেন না তাহলে পোষ মানা ও পোষ মানানোর অর্থ এবং কাউকে পোষ মানালে যে আজীবন তার জন্য দায়িত্ব বর্তায় তা অনেক আগেই বুঝতাম এবং আমার জীবনটাও অন্যরকম হত। তাই এখন যখন যেখানে যাই বইটি কিনে শিশুদের উপহার দিই। এই তো সেদিন কলকাতা গিয়ে বইটি খুঁজতে বেরই এবং নেহাৎ দৈবক্রমেই খোদ প্রকাশকের দোকানে হাজির হলে শুনতে হয় 'বলুন তো মশায়, যে-দেশে দু'হাজার "ছোট রাজকুমার" দশ বছরেও কাটে না সেখানে ভাল বই ছাপানোর মানে কি?' তাকিয়ে দেখি তার চেহারাটা বইয়ের ৪৪নং পৃষ্ঠার সেই বণিকের মতো, তবে নিশ্চিত জানি মনটা অন্যরকম। দুঃখ হল কলকাতার শিশুদের জন্য। আরও দুঃখ হল একথা ভেবে যে, শহরটা সত্যজিতের। আপনারা হয়ত জানতে চাইবেন এক্সুপেরির আপন শহর লিও'র শিশুরা ছোট রাজকুমারকে ভালবাসে কিনা। জানি না, ওদিকে যাওয়া হয়নি। তবে প্যারিসের কথা বলতে পারি, অবশ্য একবারই ওখানে গিয়েছিলাম ও কেবল একজনের মতই জানতে পেরেছিলাম। তিনি মিসেস চৌধুরী, জনৈক বঙ্গসন্তানের বিদূষী ফরাসি ঘরণী, বলেছিলেন যে, এসব বইপত্র এখনকার ছেলেমেয়েরা তেমন ভালবাসে না। তবে আমি মস্কোর কথা জানি। এখানে অনেকদিন আছি। 'মালিঙ্কি প্রিন্স' (মালিঙ্কি অর্থাৎ ছোট) তাদের আপনজন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওটা পাঠ্য, একটি ব্যালেও আছে, অপূর্ব, দেখে বেরলে মাটিতে পা ঠেকে না, মনে হয় উড়ে চলেছি একঝাঁক পাখির ডানায় বাঁধা সুতো ধরে। বলতে বাধা নেই, আমার পরম সৌভাগ্য যে মধ্য-যৌবনে হলেও শেষ পর্যন্ত জহুরুল হকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, দুই-সংস্কৃতি ভুবনে অবাধ ভ্রমণশীল এই অধ্যাপক তাঁর অনূদিত 'ছোট রাজকুমার' আমার হাতে তুলে দিয়ে এখন জানি, আংশিক হলেও আমাকে পোষ মানিয়েছেন, কেন-না এই দূরদেশে এতদিন পরও প্রায়ই তাঁর কথা মনে পড়ে এবং যখন ভাবি ছোটখাটো, আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল এই মানুষটি একাত্তরের হায়না কবলিত বাংলাদেশে এক মিথ্যা বিবৃতিতে সই না দিয়ে নৃশংস মৃত্যুর যে-ঝুঁকি নিয়েছিলেন তাতে এই ছোট রাজকুমারের কিছুটা প্ররোচনা ছিল তখন তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের দুঃখটা অদম্য হয়ে ওঠে।

ফরাসি ভাষা অজানা ও জানা ভাষাগুলোতে এক্সুপেরির জীবন বৃত্তান্তমূলক বইপত্রের অভাব থাকার জন্য আমি তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যেটুকু লিখেছি তার মালমশলা সবই পরোক্ষ সূত্রে ও অন্যদের জবানী থেকে পাওয়া, সেজন্য তা একাধারে অসম্পূর্ণ, এলোমেলো ও অকিঞ্চিৎকর।

আতোয়াঁ দ্য সাঁ-এক্সুপেরির জন্ম ফ্রান্সের লিওন শহরে ১৯০০ সালের ২৯ জুন, ১৯২০ পর্যন্ত লেখাপড়া স্কুলে, অতপর কিছুকাল কারখানায় কাজ, ১৯২৬ সালে

বেসামরিক বিমানের বৈমানিক। এই বছরই তাঁর প্রথম গল্প 'বৈমানিক' কাগজে বেরোয়। ১৯২৭-২৯ পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় একটি বিমানবন্দরের পরিচালক থাকাকালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দক্ষিণের ডাকপিয়ন' (১৯২৯)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা ইউরোপে জায়মান আত্মানুসন্ধান এবং এই সঙ্গে সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা ও পলায়নপরতার টানাপোড়েনের বৈশিষ্ট্যে বইটি পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং ১৯৩৭ সালে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। ১৯২৯-৩১ পর্যন্ত এক্সুপেরি উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় বৈমানিকের কাজ করেন এবং কিছুকাল পরীক্ষামূলক বিমান চালান। ১৯৩০ সালে আর্জেন্টিনার বুয়েন্স অ্যারেন্সে লেখা ও ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'রাতের উড্ডয়ন' থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি চলচ্চিত্র (১৯৩২) এবং ইতালীতে অপেরা (১৯৩৯) তৈরি হয়েছিল। তৎকালীন জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিমান কোম্পানির নানা সমস্যা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরোধ, প্রশাসনিক স্বৈরাচার ইত্যাদি ঘটনাই বইটির বিষয়বস্তু। এটি তাঁর বিমান কোম্পানির ম্যানেজারকে উৎসর্গিত, তেমন একটি চরিত্রই কাহিনীর নায়ক, যে জীবনের গূঢ়ার্থ সন্ধানী এক মহৎ মানুষ। কিন্তু কোম্পানির ওই ম্যানেজারটির চেহারা অধস্তন কর্মচারীদের কাছে ছিল ভিন্নতর একটি অকাট অমানুষ, তাই তারা এজন্য এক্সুপেরির ওপর ক্ষুব্ধ হন। বইটি সম্পর্কে দশ বছর পর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন: 'ভয়কে জয় করা খুবই জরুরি। নিজে বহুবার মারাত্মক বিপদে পড়েছি। মানুষকে তাই নির্ভয় করতে চেয়েছি। এটাই রাতের উড্ডয়ন কাহিনীর প্রধান বক্তব্য।'

বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংঘাত, নানা ব্যক্তিগত সমস্যা, স্পেনের স্বৈরতন্ত্র ও জার্মানির ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে না পারার যন্ত্রণা ও অক্ষম ক্রোধে তাড়িত এক্সুপেরি কিছুকাল দেশভ্রমণে কাটান এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৩৫) ও স্পেন (১৯৩৬-৩৭) সফর করেন।

গুয়াতেমালায় বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন থাকাকালে লেখা 'মানুষের গ্রহ' (১৯৩৯) ফ্রান্সের সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার এবং ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেস্টসেলার হওয়ার শিরোপা পায়। বক্তব্য হল আমরা সকলে একই গ্রহের বাসিন্দা, একই জাহাজের যাত্রী। নাৎসিবাদের উত্থানের পটভূমিতে ইউরোপে ও বৈদেশিক উপাদানের জন্য আমেরিকায় বইটি এতটা জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

১৯৩৯ সালে এক্সুপেরি যুদ্ধে যোগ দেন এবং ফ্রান্সে জার্মানির দখল কায়েম হলে ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশান্তরী হন। এক্সুপেরি ১৯৪৩ সালে বৈমানিক হিসেবে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসি প্রতিরোধবাহিনীতে যোগ দিলে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত, 'জঙ্গী-বিমানের বৈমানিক' (১৯৪২) ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ফ্রান্সে গোপনে মুদ্রিত ও প্রচারিত হতে থাকে। যুদ্ধের পরিস্থিতি মানুষের বিবেকের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে — বইটির এই বক্তব্য সকল রাজনীতিকদের জন্যই অপ্রিয় বিধায় শুধু অধিকৃত ফ্রান্সেই নয়, উত্তর আফ্রিকায় দ্য গলের লোকেরাও বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। 'পণবন্দীর কাছে পত্র' (১৯৪৩) এক বন্ধুকে, আসলে গোটা ফরাসি জাতির উদ্দেশে লেখা একটি আবেদন — দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতার, মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান।

'মানুষের গ্রহ' উপন্যাসে অঙ্কুরিত ও 'জঙ্গী বিমানের বৈমানিক' কাহিনীতে বিকশিত এক্সুপেরির দর্শনচিন্তা 'পণবন্দীর কাছে চিঠি' গ্রন্থে গভীরতা ও পূর্ণতা পেয়েছে।

'ছোট রাজকুমার' লেখা শুরু হয়েছিল নিউইয়র্কে ১৯৪২ সালে, বেরোয় পরের বছর ১৯৪৩ সালে মৃত্যুর এক বছর আগে। 'দক্ষিণের ডাকপিয়ন' উপন্যাসে অঙ্কুরিত ভাবনাগুলো দীর্ঘকাল তাঁর চিন্তায় পল্লবিত পুষ্পিত হয়েছিল। একটি ছবি বারবার এঁকেছেন — একটি শিশু, তার ডানা আছে বা নেই, সে মেঘের ওপর থেকে পৃথিবীর দিকে, বাড়ির দিকে, ভেড়ার পালের দিকে তাকায়। অবাক-করা ওই শিশুটি সেই মানুষটিকে মুহূর্তকালও স্বস্তির অবকাশ দেয় না যে একাধারে বৈমানিক, যোদ্ধা ও মানুষের আত্মিক উন্নয়নের অক্লান্ত প্রচারক। মরুভূমির নিঃসঙ্গতায় বিধ্বস্ত বৈমানিকের সামনে রাজকুমারের প্রেম, বিরহ ও মৃত্যুতে একটি যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান ঘটলেও তাতে অন্যত্র জীবনের আশ্বাস নিহিত থাকায় তা ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে না।

এক্সুপেরি 'সিটাডেল' লিখতে শুরু করেছিলেন ১৯৩৬ থেকে, অতঃপর অন্যান্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে অবিরাম লেখাটির কলেবর বৃদ্ধি করেছেন, প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৮ সালে একটি অসম্পূর্ণ রচনাসংকলন হিসেবে। মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধে তাড়িত এক্সুপেরি বিষণ্নতা, নিঃসঙ্গতা, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতার কাছে কখনই আত্মসমর্পণ করেন নি, খুঁজেছেন পূর্ণতার জীবন, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মেলবন্ধন এবং তাঁর এই প্রয়াসে সহায়তা পাবার আশায় বেছে নিয়েছিলেন বৈমানিকের দুঃসাহসী জীবন।

'তাহলে দেখো, এখানেই এক মহারহস্য। কোনখানে ঠিক কোথায় জানি না, একটি ভেড়া যাকে কোনদিন দেখি নি, একটি গোলাপ খেয়ে ফেললো কিনা তার ওপরই নির্ভর করছে তোমরা যারা ছোট রাজকুমারকে ভালবাস তাদের ও আমার সবকিছু। আকাশের দিকে তাকাও, নিজেকে শুধাও ভেড়া গোলাপটি খেয়েছে কিনা, দেখবে সবকিছু কেমন বদলে যায়।'

কিন্তু এই মহারহস্যের প্রতি আমাদের নিষ্প্রেম সভ্যতা বড়ই নিস্পৃহ আর এটাই সভ্যতার ট্র্যাজেডি।

অমৃতের পুত্র

'সুখী রাজপুত্র' গল্পের ঈশ্বর আরেকবার তার দূতকে পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তুসন্ধানে পাঠালে, নিশ্চিত জানি, তিনি ইয়ানুশ কার্চাকের দেহাবশেষ খুঁজবেন এবং এও জানি যে সুখী রাজপুত্রের সীসক হৃদপিণ্ড ও মৃত চাতকের মতো তা সহজলভ্য হবে না, কেন না নাৎসি গ্যাসচেম্বারে ভস্মীভূত কার্চাক মিশে গেছেন জল-স্থল-অন্তরীক্ষের জড়কণায়, প্রাণিশরীরে, তৃণেপুষ্পে ও আমাদের স্মৃতিতে। প্রবীণ কার্চাকের কোন ছবি দেখি নি। কিন্তু তাঁর কথা স্মরণে এলেই মনশ্চক্ষে একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে   এক বৃদ্ধকে ঘিরে অনেক শিশু, সামনে ভৌতিক গড়নের একটি কলঘর, ফটকে সান্ত্রী আর বৃদ্ধ যেন শিশুদের বলছেন — 'তোমরা ভয় পেয়ো না। এই বাড়িটি একটি গণস্নানাগার, ওখান থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে আমরা যাবো দূরের গাঁয়ে, ওখানে আছে একটি নদী, তাতে পালতোলা নৌকা, ওপারে সবুজ মাঠ, সেখানে তিতিরদের বাসা, ডিমে তা দিচ্ছে মা-তিতির, ডিমগুলোর সাদা জমিনে কালোর ছিটা, আমরা ওখানে দিনভর খেলব, ছুটোছুটি করব'—এমন এক রূপকথা। আমাদের সভ্যতার কাঠামো তো আসলে একটি হিমশৈলের মতো, তার দৃশ্যমান আগাটুকুই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অর্জন, আলোকিত, আর দুই-তৃতীয়াংশই জলতলে দুর্লক্ষ্য, মসিলিপ্ত, জান্তব উত্তরাধিকারের জের, অস্তিত্বের সংগ্রামে পঙ্কিল, ভয়াবহ এক নিষ্ঠুরতার রাজ্য। ব্যক্তিমানুষের পরিচয়েও বলাবাহুল্য উপমাটি অপ্রযোজ্য নয়। আমাদের সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মানসে আলো-আঁধারের ভাগাভাগিটাও তদনুপাতিক, তাইতো সব প্রধান চিত্রশালার সিংহভাগ জুড়ে আছে যুদ্ধদৃশ্য ও নরমেধ, হোক তা মধ্যযুগীয় কিংবা আধুনিক শৈলীর গুয়ের্নিকা। সংস্কৃতিস্রষ্টা মানুষের প্রয়াস তো অমৃতসন্ধানী দেবকুলের পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনতুল্য, যেখানে অমৃতের সঙ্গে উঠে আসে হলাহলও, সেটা কাউকে পান করতেই হয় এবং যাকে নিয়ে আমার এই কাহিনী সেই ইয়ানুশ কার্চাক তেমনি এক নীলকণ্ঠ, ক্রুশবিদ্ধ যীশু ছাড়া তত্তুল্য অন্যতর কোন উপমা আমি আর খুঁজে পাই না।

কার্চাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি 'আবার যখন ছোট হবো' বইটির কয়েকটি পঙক্তি প্রায়ই মনে পড়ে। 'স্কুলের একটি ছাত্র কখন বেশি জ্ঞান অর্জন করে — যখন সে বোর্ডের দিকে তাকায়, নাকি যখন কোন দুর্নিবার শক্তি (সূর্যের শক্তি, সূর্যমুখী ফুলের মাথার

দোলন) তাকে বাইরে তাকাতে বাধ্য করে তখন — কেউ জানে না।' কথাগুলো কোন পেশাদার শিক্ষক বা শিক্ষাবিদের নয়, একজন চিকিৎসকের, যিনি শিশুদের ভালবাসতেন এবং এই ভালবাসাই তাঁকে মৃত্যু ও অমরত্ব দিয়েছে।

ইয়ানুশ কার্চাক আসলে সাহিত্যিক ছদ্মনাম, যথার্থ নাম হেনরিখ গোল্ডস্মিথ (১৮৭৮, জুলাই — ১৯৪২, আগস্ট)। জন্ম পোল্যান্ডের ওয়ার্শ শহরে এক আইনজীবী পরিবারে। জন্মসূত্রে ইহুদি কার্চাক স্বদেশের বাস্তবতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মানসে গোটা যৌবনকাল সংকীর্ণ ইহুদি সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখলেও শেষ পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতা টিকিয়ে রাখতে পারেন নি, সংখ্যালঘুর অধিকারহীনতা আর বঞ্চনার আঘাত ও বেদনা তাঁকে ওদের কাছেই টেনে এনেছিল। কৈশোরে পিতৃহীন কার্চাক মায়ের কাছেই মানুষ। চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হওয়ার পর তিনি বিদেশে উচ্চশিক্ষা পান ও শিশু-চিকিৎসক হিসেবে নিজ শহরে কর্মজীবন শুরু করেন। ভালই পসার জমেছিল, কিন্তু চিকিৎসা ছাড়া শিশুদের জন্য আরও কিছু করার আগ্রহে তিনি অনাথ শিশুদের লালন-পালন ও তাদের জন্য লেখালেখিতে জড়িয়ে পড়েন। ওয়ার্শর গরিব শিশুদের গ্রীষ্মকালীন শিবিরে স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক হিসেবে কাজের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নিয়ে লেখেন দু'টি বই — 'ইসিকি, মসিকি, শ্রুখি' ও 'ইউসিকি, ইয়াসিক ফ্রাঙ্কি'। এই সময় পোল্যান্ডে ইহুদিবিদ্বেষ দানা বাঁধতে থাকলে কার্চাক জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ান, পোলিশ সংস্কৃতিতে একাত্ম হওয়া তাঁর এককালের বাসনা শক্তি হারাতে থাকে এবং মানসিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে কিছুকাল স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকেন এবং কিছু ছেলেমেয়েকে প্রগতি ও মানবতার আলোকে শিক্ষাদানে ব্রতী হন। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ অতঃপর তাঁকে এই শূন্যতা থেকে মুক্তি দেয়, চিকিৎসক হিসেবে রণাঙ্গনে যান। কিন্তু যুদ্ধের বিপদ আর ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি শিশুদের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারেন না, সেখানে বসেই শিশুপালন সম্পর্কে একটি বই লেখা শেষ করেন। যুদ্ধ শেষ হলে কার্চাক ওয়ার্শ ফিরে শহরতলীতে গরিব চাষীদের ছেলেমেয়ের জন্য একটি অনাথালয় গড়ে তোলেন। শুধু সেবাযত্নই নয়, এটি ছিল শিশু-বিষয়ক একটি গবেষণাগারও। এই সময় কার্চাকের বিরতীহীন কলম তাঁর চিন্তার ফসল তুলছিল। তিনি ক্রমাগত লিখে চলেছিলেন শিশুদের বিষয়ে, শিশুদের জন্য গল্প ও উপন্যাস, শিক্ষামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক রচনালহরী। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'রাজা মাতিউশ-১' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিজের কিশোর বয়সের একটি ছবির পাশে কার্চাক লিখেছেন 'আমি যখন এই ফটোর বয়সী ছিলাম তখন এই বইয়ে যা যা লেখা আছে সবই করতে চেয়েছিলাম। পরে অবশ্য সবই ভুলে যাই এবং এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি, লড়াই করার সময় বা সামর্থ্য কোনটাই আর নেই। ফটোটা এজন্য দিয়েছি যে ওই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যখন আমি রাজা হতে চেয়েছিলাম। তবে 'রাজা মাতিউশ' লেখার সময় এসব ভাবনার কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। আমার মতে বইয়ে রাজা, অভিযাত্রী বা লেখকের বড় বা বুড়ো হওয়ার আগের ফটো

দেয়াটাই ভাল, অন্যথা মনে হবে যেন-বা তারা সব সময়ই খুব চৌকস ছিলেন, কখনই শিশু ছিলেন না। আর শিশুরা ভাববে তারা কখনই নামী লেখক, দুর্গম পথের অভিযাত্রী বা ভারিক্কি চেহারার মন্ত্রী হতে পারবে না। ব্যাপারটা মোটেও ভাল নয়। বড়রা আমার বইটি পড়বে না, কেননা কয়েকটি অধ্যায় একেবারেই তাদের পছন্দ হবার নয়, তারা সেগুলোর একটুও বুঝতে পারবে না। হয়ত হাসবেও। সবাই ভাল জানে যে তাদের থামান যায় না। তারা কারও কথা শোনার পাত্র নয়। তাদের কেই-বা কী করতে পারে।'

কার্চাক শিশুদের ভালবাসার নিরিখ হিসেবে তাদের বোঝার, শ্রদ্ধা করার, বিশেষ অধিকার দেয়ার কথা বলতেন। 'শিশুরা মানবসমাজের একটি বড় অংশ। তারা বড়দের ওপর নির্ভরশীল। তারা অবদমিত ও বঞ্চিত।' কার্চাকের অনাথালয়ে একটি শিশু-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের একটি পার্লামেন্ট ছিল, তারা পার্লামেন্টের অধিবেশনে নিজেদের মুখপত্রে, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের শুনানিতে নিজেদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া লিখিত ও মৌখিকভাবে পেশ করতে পারত। একটি শিশু-রাষ্ট্র ও শিশুদের ক্ষমতার প্রশ্নটি কার্চাককে আজীবন আলোড়িত করেছে। এগুলোই 'রাজা মাতিউশ-১' গল্পের বিষয়বস্তু। দুই-খণ্ডে লেখা এই বইটি আসলে শিশুদের এক কল্পরাজ্যের কাহিনী — রূপকথা ও সত্যঘটনা, প্রলাপ ও উদ্ঘাটন, ব্যঙ্গ ও গীতিধর্মিতার আশ্চর্য মিশেল। গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর শিশুদের জন্য সুখী জীবন গড়তে চেয়েছিলেন রাজা মাতিউশ। কিন্তু বড়দের জগতের সঙ্গে, তাদের আইন-কানুন ও বাধ্যবাধকতার সঙ্গে তার স্বপ্নের সংঘাত বাধে এবং নিহত হন শিশুবান্ধব মাতিউশ। এ যেন কার্চাকের নিজের জীবন, সংগ্রাম ও মৃত্যুর রূপকথা।

সৌখিন মজদুরির ফাঁদ

‘আপনি আমার দেশের একজনও খাঁটি মানুষ দেখেন নি। একদল ভ্রষ্ট আরামসর্বস্ব লোক, কিছু রাজনৈতিক ধুরন্ধর, সমাজের ওপর ভাসমান উচ্চকণ্ঠ শ্রেণীবিশেষ, শরৎ-নিসর্গের বর্ণাঢ্য উদ্ভাস ও সুফলা মাঠের ঐশ্বর্য প্রলুব্ধ পঙ্গপাল-ভীমরুলের দল আমার জাতির প্রতিনিধি নয়। আমাদের সাহিত্যিক? বিজ্ঞানের এ যুগে সাহিত্য তো চিন্তাকে ঘুম পাড়ানোর শয্যাবিশেষ। আর থিয়েটার? এতো এক আন্তর্জাতিক হেঁসেল, ধনীদের মনোরঞ্জনের জন্য ফরমায়েসী রান্না পরিবেশনই যার লক্ষ্য। আমাদের শ্রমজীবী মানুষের ওখানে প্রবেশ নিষেধ। আমাদের জীবনে থিয়েটারের ভূমিকা নগণ্য। জানেন, পাস্তুর সারা জীবনে দশবারও থিয়েটারে যান নি। যেকোন বিদেশীর মত আপনিও আমাদের উপন্যাস, নাটক, রাজনীতি সম্পর্কে অত্যুৎসাহী। আপনার যদি ইচ্ছে হয় আপনি এমন সব মহিলা ও পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন যারা আমার দেশবাসীর ভাবমূর্তির প্রতীক অথচ তারা কেউই জীবনে একখানিও উপন্যাস পড়েন নি, কোনদিন থিয়েটারে যান নি কিংবা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না। আপনি আমাদের বিজ্ঞানী ও তরুণ কবিদের দেখেন নি, দেখেন নি আমার নিঃসঙ্গ নীরব শিল্পীদের, আমাদের বিপ্লবের অনির্বাণ শিখাকে। আমাদের মহৎ নাস্তিক কিংবা খাঁটি ধার্মিক কোন মানুষের সঙ্গেও আপনার সাক্ষাৎ ঘটে নি। এখানে যে দরিদ্র মহিলাটি আপনার সেবা করেন তার সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন? নিচতলার অন্ধকারে আমাদের জনতার যে-অংশ প্রচ্ছন্ন তাদের আপনি কখনও দেখেছেন? এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না জানলে আপনার এদেশ দেখা সম্পূর্ণ হবে না। আমাদের শহরের অলিগলি ও দূরতর গ্রামাঞ্চলে স্বল্পসংখ্যক যেসব দুঃসাহসী নারী-পুরুষ আছেন তাদের সম্পর্কেও আপনি কিছুই জানেন না। তাদের জীবন অবশ্যই বর্ণাঢ্য নয়, তারা দুশ্চিন্তাজর্জর বিমর্ষ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তারা অবক্ষয়ের ধকলে নিস্তেজ নিষ্প্রাণ, কিন্তু আসলে এদের সুপ্ত প্রাণশক্তি অপরিসীম। এই নীরব অসীম সহনশীল জনগোষ্ঠীই আমাদের শক্তির উৎসমূল। আমাদের সমাজের তথাকথিত এ্যালিটগোষ্ঠী প্রতি সংকটকালে যখন অবক্ষয়ে উবে যায় তখন আমরা এদের মধ্য থেকেই প্রাণশক্তি আহরণ করে বেঁচে উঠি। এদেশে এমন লোক দুষ্প্রাপ্য নয় যারা কেবল সুখের জন্য কিংবা যেকোন মূল্যে সুখ আহরণের জন্য বেঁচে থাকেন না, বাঁচেন একটি বিশ্বাসের জন্য। আমার চেয়ে সহস্র গুণ ধার্মিক ও বিনয়ী লোক এদেশে আছেন যারা আমৃত্যু তাদের আদর্শে নীরবে অটল থাকেন। আমাদের মিতব্যয়ী নিয়মনিষ্ঠ পরিশ্রমী শান্ত মধ্যবিত্তদের সম্পর্কেও আপনি অবহিত নন, যারা হৃদয়ের

গভীরে এক অনির্বাণ দীপশিখাকে যুগযুগ ধরে প্রজ্বলিত রেখেছেন, যারা দুর্দিনে আমার দেশকে স্বার্থপর ক্ষমতালোভীদের গ্রাস থেকে বার বার রক্ষা করেছেন। আত্মশক্তিতে প্রোজ্জ্বল, সূর্যের মত দীপ্তিমান আমার এমন কোন স্বদেশবাসীকে আপনি কি কখনও দেখেছেন যার বিকীর্ণ আভায় সব হীনতা, ভণ্ডামি নিমেষে বিলীন হয়? আমাদের জীবনসংগ্রামের নগ্ন রুঢ়তায় আপনি এজন্যই আহত, কারণ এর লক্ষ্য আপনার কাছে স্পষ্ট নয়। আপনি শুধু আমাদের জীবনসত্তার ছায়া দেখেছেন তার অবয়ব প্রত্যক্ষ করেন নি। আমরা হাজার হাজার বছর ধরে কর্ম ও সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে আছি

সন্দেহ নেই, স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে এ প্রতীতি রোমান্টিক, কিন্তু মিথ্যা নয় এবং সকল দেশেই প্রযোজ্য। জাতির দুর্মর সত্তা সম্পর্কে এ আশাবাদ অন্তরাশ্রয়ী, পরিসংখ্যাননির্ভর নয়। শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব তাই বিপুল ও বহুমুখী। কল্পিত আশাবাদ, অলীক দর্শন কিংবা অবাস্তব জাত্যাভিমান শিল্পীকে স্বধর্মচ্যুত করলেও বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের সম্ভাবনা উন্মোচনে তার স্বাধীনতা স্বীকার্য।

বিগত পঁচিশ বছর দীর্ঘ আমাদের সাহিত্য সাধনায় এই স্বধর্মচ্যুতির স্বাক্ষর যত স্পষ্ট, সম্ভাবনা আবিষ্কারের প্রয়াস সে পরিমাণেই ক্ষীণ। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির জীবনসত্তার পরিচয় আবিষ্কারে আমাদের ব্যর্থতা যত না প্রতিভার দৈন্যে, ততোধিক শ্রমবিনিয়োগের অনীহায়। পরিচর্যার অভাবে যে-শিল্পীমানস অনচ্ছ, জীবনের সমগ্রতার প্রতিফলন সেখানে অসম্ভব। এই চূর্ণিত, বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বাস্তবতা থেকেই উদ্ভূত আমাদের সীমিত সংখ্যক সার্থক ছোটগল্প, কবিতা ও অপরিণত ব্যর্থ উপন্যাস। স্মর্তব্য, শিল্পকর্মের কোন দেশজ পরিমাপে আস্থা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল এবং নিম্নমানের সৃষ্টি ব্যর্থতারই নামান্তর। পরিচর্যাহীন আমাদের এই শিল্পীমানস বিশাল ও সুগভীর জীবনধারার সঠিক প্রতিফলনের উৎকর্ষতা কবে অর্জন করবে আপাতত তা দুর্নিরীক্ষ্য। আমাদের কথাশিল্পীরা পূর্বসূরিদের উপজাত কিংবা আমদানিকৃত বিদেশী সাহিত্যের অত্যাধুনিক প্রতীতিসমূহের নবীকরণ ও দেশীকরণে বৃথাই গলদঘর্ম। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে বিপুল প্রাণশক্তির উদ্ভাস অন্ধের চোখেও সংবেদন সৃষ্টি করেছে তা মোটেই আপতিক নয়। দেশের মানুষ তার আত্মার গভীরে অশেষ দুঃখ দারিদ্র্য হতাশার মধ্যেও এ সম্ভাবনাকে যুগ যুগ সযত্নে লালন করেছেন। শলোকভের 'দ্যা ফেইট অব অ্যা ম্যান' গল্পের নায়ক আজ এ-দেশে দুর্লভ নন। মুক্তিযুদ্ধে এ ধরনের বহু চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, যাদের অস্তিত্ব আমরা অবহিত ছিলাম না। অথচ এই নিঃশব্দ অসীম সহনশীল জনগোষ্ঠীই আমাদের শক্তির উৎস। পটুয়াখালির সুন্দ্রাকালিকাপুরের গাজী আতাহার উদ্দিন, ঢাকা জেলার দড়িপাড়াবাসী হোটেল পরিচারিকা মরিয়ম, নাগরী অঞ্চলের খ্রিস্টান-সম্প্রদায় এবং বাইরা গ্রামের সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের ব্যতিক্রম কিছু নন। অশীতিপর বৃদ্ধ গাজী সাহেব যাঁকে আমি একজন ধার্মিক মানুষ হিসেবেই চিনি, তিনি যখন পুত্রের হিন্দু-বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য অসম্ভব দীর্ঘ, ভয়ংকর নির্জন ও মৃত্যুকীর্ণ পথে তাকে

John Chriotopher, Roman Rolland, Vol. 3, Jupiter Book, London, 1966, PP 288–289.

নিয়ে স্বগ্রাম যাত্রা করেন তখন তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করি, শ্রদ্ধায় অবনত হই। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে বাংলাদেশের সম্ভাব্য স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার হতাশ মন্তব্যে আহত দড়িপাড়ার মরিয়মের ক্ষুব্ধ আর্তনাদ — 'স্যারে কয় কী, জয়বাংলা নাকি অইব না' আজও শুনতে পাই। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে নাগরী অঞ্চলের সাধারণ মানুষ বিশ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর জন্য তাদের গৃহদ্বার উন্মুক্ত করে অবিশ্বাস্য সাহস ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পাক-সৈন্য আক্রান্ত বাইরা গ্রামের পলায়মান ঊর্ধ্বশ্বাস জনতাকে আমি দেখেছিলাম এবং স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম অনুচ্চ কান্নার মতো, হৃদস্পন্দনের মতো, প্রার্থনার মতো তাদের কণ্ঠনিসৃত প্রবহমান শব্দপুঞ্জ — 'জয়বাংলা'। এসবই সত্য ঘটনা এবং বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। সন্দেহের অবকাশ নেই যে ততোধিক মহত্তর কিংবা ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী এদেশে বহুজন। আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য। যুদ্ধকালে যখন জীবনের, সহায়-সম্বলের কোন নিশ্চয়তা থাকে না, মানুষ তখন নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে, তার দোষ-গুণ, বীরত্ব ভিরুতা, উদারতা ও সংকীর্ণতা সবই খোলসা হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতি প্রতিদিন ঘটে না। এ এক দুর্লভ সময় জনগোষ্ঠীকে জানার। আমাদের অনেক কথাশিল্পীই তা দেখেছেন যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের কাঁচামাল। কিন্তু তার অংশমাত্রও কি আমাদের সাহিত্যে চিত্রায়িত হবে? বিজয়ী বাংলাদেশ যখন নদনদীর অববাহিকার মতই উর্বর তখন 'পদ্মানদীর মাঝি'র উত্তরসূরিরা কোথায়? আমাদের জীবনের এই সুবর্ণ মুহূর্তের প্রতিভাসকে চিরায়িত সাহিত্যে রূপায়িত করবে কে?

আমাদের কথাসাহিত্যের দৈন্য বহুচর্বিত প্রসংগ। আমরা এ সমস্যার ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণসমূহ কিছুটা হলেও তা জানি। কিন্তু এ দৈন্যে আমাদের ব্যক্তিগত অবদানও কম নয়। আমরা শ্রমবিমুখ ও অল্পে যশপ্রার্থী। একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনার পূর্বশর্ত বৎসরাধিক কালের নিরলস গবেষণা। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের একজন কথাশিল্পী একটি রচনার জন্য কী পরিমাণ শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করেন? কল্পনাশক্তির জাদুমাহাত্ম্য যতই বিস্ময়কর হোক কোনক্রমেই তা ন্যায্য স্বেদমোক্ষণের বিকল্প নয়। কোন অজুহাতের আড়ালে আত্মরক্ষা কথাশিল্পীর পক্ষে ধোঁকাবাজির সামিল। স্মর্তব্য, বিজ্ঞান গবেষণায় কোন প্রকল্পের ব্যর্থতা সম্পূর্ণ ঋণাত্মক নয়, কিন্তু নিকৃষ্ট শিল্প অপচয়মাত্র। সাড়ে সাতকোটি মানুষের দেশে এযুগে সাহিত্যশিল্পে প্রতিভার দৈন্য কষ্টকল্পনার উদাহরণ। আসলে আমাদের কথাশিল্পীরা প্রতিভার দৈন্যপীড়িত নন, আলস্য ও সহজ সাফল্যের ব্যাধিতে প্রবলভাবে আক্রান্ত। বৈষয়িক উন্নতির প্রয়াসে সময় ও শক্তির সিংহভাগ ব্যয় এবং খ্যাতির জন্য (স্মরণীয় পাক আমলে পুরস্কার লাভের সেই হিড়িক) পার্টটাইম সাহিত্যচর্চার শৌখিন মজদুরিতে শিল্পসিদ্ধি অসম্ভব।

এককভাবে বৈষয়িক তাড়নায় বুদ্ধিচর্চায় ব্রতী হওয়া নিন্দনীয় হলে তা শুধু সাহিত্যিকের নয়, গোটা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রাপ্য। আমরা জানি এ মানসিকতার উৎস ১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা। সেই সময় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সমাজকাঠামোয় যে-পরিবর্তন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর অখণ্ড বাংলার সমাজবিবর্তনের সঙ্গে

তা অনেকাংশে তুলনীয়। উভয় ক্ষেত্রই প্রাচীন বনেদী শ্রেণীর উৎখাত, শিল্পশাসিত নগরের পত্তন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দালালির প্রসার, কৃষকের দুর্দশা বৃদ্ধি, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব প্রভৃতি ঘটনা ঘটে এবং তা উভয়তই ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থে। ফলশ্রুতিতে উল্লেখ্য ব্যতিক্রম ছিল মাত্র একটি এবং তা বাংলার রেনেসাঁ। পাকিস্তানি স্বাধীনতা আমাদের জন্য রেনেসাঁর ঐশ্বর্য আহরণে ব্যর্থ হয়েছিল বলে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তেরা আজ সৃজনীশক্তির বহুমুখী উচ্ছ্বয় থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কারণটি দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সংস্কৃতি হল দেশজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার এক সার্থক সংকর এবং তার প্রাণশক্তির প্রবল উদ্ভাস আসলে এক ধরনের সংকরসাবল্য বা হাইব্রিড ভিগর। নবজাগ্রত বাঙালি মধ্যবিত্তের বুর্জোয়া অভীপ্সার সঙ্গে স্পন্দমান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সম্বন্ধ স্পষ্টতই মণিকাঞ্চনযোগ। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ব্যত্যয়টি সহজলক্ষ। মধ্যযুগীয় এক সংস্কৃতির সঙ্গে অসম্ভব সংকরণের চেষ্টায় সাবল্যের পরিবর্তে আমরা পেলাম শুধুই বন্ধ্যাত্ব, হাইব্রিড স্টিরাইলিটি। ফলত বর্ণাঢ্য প্রস্ফুটনের ঐশ্বর্য এল না। পাশ্চাত্যের দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত থাকলেও ততদিনে দুই মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে সেই সংস্কৃতি জরাগ্রস্ত এবং তা থেকে প্রাণশক্তি আহরণের সম্ভাবনা উধাও।

একটি রেনেসাঁর আমাদের বড় প্রয়োজন ছিল। আমাদের সমস্ত জাড্য, সমস্ত বিভ্রান্তির অবসান শুধু এরই জাদুস্পর্শে সম্ভব। অন্যথা না সাহিত্যিক, না বিজ্ঞানী, কারও কাছে আমাদের কোন প্রত্যাশাই পূর্ণ হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশেও এই সম্ভাবনা অদূরবর্তী নয়। সুতরাং আমাদের ভাগ্যে কি এবারও ফলদ ঐশ্বর্যের বিনিময়ে দৈহিক স্থূলত্ব ক্রয়ের সেই একই ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি ঘটবে?

মানুষ পরিবেশ-প্রভাবিত হলেও সে পরিবেশের দাস নয়। এটাই আপাতত একমাত্র আশাবাদ এবং তা বাঁচিয়ে রাখার দায় কথাসাহিত্যিকেরও। মুক্তিযুদ্ধে আমরা স্বদেশের যে-ভাবমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছি তার দীপ্তি কথাসাহিত্যেই অম্লান রাখা সম্ভব। একটিমাত্র জীবন্ত চরিত্র, একটি মাত্র ঘটনার সার্থক চিত্ররূপ কার্যত একটি শহীদ মিনারের মতোই শক্তিশালী। এই চেতনাকে সংহত করার, নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করার বহুলাংশ দায় আমাদের কথাশিল্পীদের। রেনেসাঁ যদি আমাদের জন্য নতুন উত্তাপের উৎসমুখ উন্মোচিত নাও করে, শিল্পীর পক্ষে তবু একটি বিকল্প নির্মাণ সম্ভব। অতিসীমিত উত্তাপে উদ্ভিদ যেমন সালোকসংশ্লেষের দুরূহ কর্মসম্পাদন করে, শিল্পীও তেমনি জানেন আত্মার উত্তাপ সংরক্ষণ ও নতুন সম্ভাবনার সংশ্লেষে তা সদ্ব্যবহারের রহস্য। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি, অদম্য সাহস ও নিরলস শ্রম। আমাদের কথাশিল্পীর কাছে এটুকুই আমাদের প্রত্যাশা।*

---

* লেখাটি ১৯৭৩ সালে 'গণসাহিত্য' মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলন থেকে এটি বাদ দিতে চেয়েছিলাম, কেননা সাহিত্যতত্ত্ব আমার বিষয় নয়। তবু শেষপর্যন্ত রাখলাম, সেসময় সোনার বাংলা গড়ার উত্তুঙ্গ প্রত্যাশায় আমরা কতটা আবিষ্ট ছিলাম, তার একটি নজির হিসেবে। রোমাঁ রোলাঁর উদ্ধৃতিটি, কিছুটা হলেও, আমাকে এক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে।



বন্ধু রহো রহো সাথে

লেখাটির দায়িত্বভার নিয়ে লিখতে বসে দেখলাম দীর্ঘদিন প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক লেখালেখিতে আমার জ্ঞানের পুঁজি, যার সিংহভাগই যুগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এই বয়সে আবেগের পর্যাপ্ত বারিসিঞ্চনেও মস্তিষ্কে নতুন চিন্তা গজায় না, 'দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মতো গোলাপফুল', পুরান ভাবনাগুলোর পুনর্বিন্যাসের চেষ্টাও শ্রমসাধ্য ও কালক্ষেপক, অথচ না লিখেও উপায় নেই। এভাবেই এটি লেখা হলো — অতিসংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত, যেজন্য আমি পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার কৈশোরে চল্লিশের দশকে সিলেটের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ভূমিনির্ভর নিশ্চিন্ত পরিবেশে সঙ্গীতচর্চার যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল, গানের আসর বসত উপলক্ষ ও উপলক্ষহীনতা নির্বিশেষে, গীত হতো প্রধানত রাগপ্রধান, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন এবং নজরুলগীতিও, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আমার প্রথম ভাল-লাগা গান 'তুমি যে গিয়েছ বকুলবিছান পথে' তাই কোনো ব্যতিক্রম নয়। কিছুটা অপ্রকৃতস্থ এক সৈয়দ সাহেব মাঝেমধ্যে সাহায্যের আশায় আমাদের বাড়ি আসতেন, গাইতেন 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে' গানের কয়েক পঙ্‌ক্তি, দ্রুত লয়ে, মুগ্ধ হয়ে শুনতাম, সেই মুগ্ধতার রেশ আজও কাটে নি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনের ধ্রুবতারা' হয়ে ওঠার পরও নজরুলগীতির প্রতি আকর্ষণ এতটুকুও কমে নি, ভাবি মুসলমানপ্রধান এলাকায় কৈশোর কাটানোর সুবাদে গ্রামের মক্তবে প্রতিদিন আরবি পুঁথিপাঠের নিত্যবহতা সুরধ্বনি এই পটভূমি তৈরি করে থাকবে। আরেকটি হেতুও বিবেচ্য — নজরুল গীতি অধিকতর শোণিতঘনিষ্ঠ।

আমার প্রথম শোনা রবীন্দ্রসঙ্গীত 'এত দিন যে বসে ছিলাম', গেয়েছিল স্থানীয় স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে এখানকার নিরাপদ আশ্রয়ে আসা একটি ছাত্র। ভাললাগার সঙ্গে স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগের কল্যাণেই গানটি আজও আমাকে আলোড়িত করে। 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' শুনি আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে। আমি তখন সেখানে পড়তাম। আরেকটি গানের কথাও ভোলার নয়। চলেছি শেয়ালদা থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীটের সিটি কলেজে যথারীতি পদব্রজে। চৈত্রের দুপুর। হঠাৎ কানে এল 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুনমাসে কী উচ্ছ্বাসে ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেলা', গানটি বাজছিল এক দোকানের রেডিওতে। গতিরহিত আমি পাঠ্যবইয়ের মলাটে গানটি লিখতে থাকি, সময় যায়, গানের

রেশ আর শেষ হয় না। 'কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে।' এখন ভাবি প্রকৃতি বিষয়ে অদ্যাবধি যা লিখেছি তাতে সৌন্দর্যের যেটুকু মাত্রা আছে সবই এই গানের সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই একান্ত অজান্তে আমার জীবনের চালিকাশক্তির আনুষঙ্গিক অনুঘটক হয়ে উঠেছেন, আমার জন্য বেঁচে থাকার একটি বিকল্প জগৎ নির্মাণ করে দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার সহপাঠী নেহাল হোসেন আওরংজেব আমাকে 'বনবাণী'র একটি শোভন সংস্করণ পড়তে দিয়েছিলেন, কোনোদিন আর ফিরিয়ে নেন নি। আমি এক সময় সেটি হারিয়ে ফেলি, লম্বা সাইজের কাপড়বাঁধাই এই সংস্করণটি আর বাজারে পাই নি। 'বনবাণী' কালক্রমে আমার 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর' দিশারী হয়ে ওঠে। নেহাল ইচ্ছাকৃতভাবেই কাজটি করে থাকবেন এবং এভাবে আমাকে চিরঋণী বানিয়েছেন। বনবাণীর কবি, সেইসব দিনে যখন পরিবেশ বিপন্নতার বিষয়টি ভারতে প্রায় অজানাই ছিল, তখন আমাদের গাছগাছালিকে, পাখপাখালিকে ভালবাসতে বলেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে মিথোজীবিতামূলক জীবনচর্চার কৌশল শেখাতে চেয়েছেন এবং বিশেষভাবে জীবজগতের সৌন্দর্য সম্পর্কে বাঙালি নির্মাতাদের তাদের সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাত্রা সংযোজনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

রাশিয়ায় থাকার সময় তাদের 'লিয়েন' (অরণ্য) নামের পত্রিকায় 'বনবাণী' নিয়ে একটি লেখা পাঠিয়েছিলাম। সেটি সাদরে গৃহীত হয় এবং তারা নামী এক কবিকে দিয়ে উদ্ধৃত কবিতার পঙক্তিগুলো অনুবাদ করান। বহুখণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী রুশভাষায় অনূদিত হলেও সম্ভবত বনবাণী তখনও তর্জমা করা হয় নি। আশির দশকে রাশিয়ায় 'গীতবিতান' অনুবাদ শুরু হয়। দায়িত্বে ছিলেন বরিস কারপুসকিন, আমাদের বন্ধু। প্রায়ই ফোন করে বাংলার গাছগাছালি, ফুলফল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইতেন। একদিন রাত বারোটায় তাঁর ফোন। জিজ্ঞাস্য কদম্বকেশরের রঙ কেমন? সঠিক জবাব দিতে পারি নি। কারপুসকিন হঠাৎই মারা গেলেন। ভেবেছিলাম তাঁকে বনবাণী অনুবাদ করতে বলব। বলা আর হলো না। বনবাণী বিশ্বের প্রকৃতিসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। গ্রিন পিস-এর মতো বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি সুরক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলো ইংরেজিসহ অন্যান্য প্রধান ইউরোপীয় ভাষায় বইটি অনুবাদ ও প্রচার করলে সেটি তাদের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠত। এতে শুধু প্রকৃতি সংরক্ষণের বিষয়গত উপকারিতাই নয়, আছে সৌন্দর্যতত্ত্ব, দর্শন আর প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাচ্যমানসের স্বকীয় অনুভবও যেজন্য পাশ্চাত্যচিত্ত আজ যথেষ্ট পিপাসিত।

রাজনৈতিক বিপ্লবে গান গণচেতনার উদ্বোধন ঘটায়। এসব গানের শব্দ ও সুর উত্তেজনভরপুর হয়ে থাকে। রোমাঁ রোলাঁ তার মানসপুত্র ক্রিশতফকে দিয়ে ফরাসি বিপ্লবে গান লিখিয়েছেন, যে-গান সর্বত্র গীত হয়েছে। নজরুল ইসলামও এমন গান লিখেছেন এবং সে তো যে-সে গান নয়, রীতিমতো সুরের আগুন, 'যে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে'। তাঁর গানগুলো ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের মতো পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক যুগের সকল গণআন্দোলনেও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, অভিন্ন ভূমিকা রাখবে ভবিষ্যতের গণদাবি আদায়ের সংগ্রামে। কিন্তু নম্রমধুর সুরের, বাউল অঙ্গের 'আমার সোনার বাংলা' কোন

আগুন না-ঝরিয়েও কী গুণে মুক্তিযুদ্ধের সময় হঠাৎ করেই উত্তাল জনচিত্তে পাকাপোক্ত দখল কায়েম করল, একটি সহিংস সংগ্রামে গতিসঞ্চারী ভূমিকা পালন করল, সে এক রহস্য। এ কি বাঙালি মানসের কোনো স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যাতে বিপ্লবকেও মাধুর্যপৃক্ত হতে হয়? বাংলার সব ধর্মবিপ্লবও কি এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়?

রবীন্দ্রগানে নিমগ্ন থাকার কি এমন কোনো পটভূমি থাকে যা উপন্যাস পাঠে নির্মিত হয়? গানের বিমূর্ততা কি উপন্যাসের কাহিনীতে কোনো বাস্তুভিত খুঁজে পায়? একটি গান কি শুধু ভাবসম্পদের জন্যই আমাদের আবিষ্ট করে, নাকি সেটা কোনো ঘটনার সঙ্গে অন্বিত বলেই তা ঘটে? 'সুন্দর মম গৃহে আজি' গানটি শুনলে ভাবি মানুষের জীবনে কি এমন ঘটনা ঘটে, নাকি আমার জীবনে কখনও ঘটেছে, কিংবা ঘটেনি বলেই কি এই মুগ্ধতা? 'এই লভিনু সঙ্গ তব' সম্পর্কেও আমার অভিন্ন জিজ্ঞাসা। আমাদের সময় রোমাঁ রোলাঁর জ্যাঁ ক্রিশতফ ব্যাপক পঠিত হত। এই গানগুলো শুনলেই ওই উপন্যাসের একটি দৃশ্য চোখে ভাসে। ফরাসি বিপ্লবে প্রিয়তম বন্ধুকে হারিয়ে বিধ্বস্ত ক্রিশতফ সুইজারল্যান্ডে নির্বাসিত। একদিন অকস্মাৎ দেখা হলো প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমিকা গ্রাজিয়ার সঙ্গে — দুই সন্তানের জননী, বিধবা। ক্রিশতফ তার বাড়ি আসেন, কিন্তু অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও গ্রাজিয়া ক্রিশতফের বাড়ি যান না। শেষে রাজি হলেন এক শর্তে — ঘরটি যেমন আছে তেমনই থাকবে, সাজান-গুছান চলবে না। গ্রাজিয়া এলেন, বসলেন সবচেয়ে অন্ধকার কোণে, নিঃশব্দে। কোন কথা খুঁজে না পেয়ে ক্রিশতফ বসলেন পিয়ানোয়। চোখ বুজে বাজালেন আধঘণ্টা ধরে। সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে রাখল প্রিয়তমার স্মৃতি, অপার আনন্দে ভরে উঠল মন আর তখনই গ্রাজিয়ার কাছে উন্মোচিত হলো গোটা ঘরের সৌন্দর্য, সবকিছু পরিপূর্ণ হলো এক স্বর্গীয় ঐকতানে, শুনতে পেলেন ক্রিশতফের বেদনাদীর্ণ-হৃদয়ের স্পন্দন যেন বাজছে তারই বুকে। 'পুণ্য হলো অঙ্গ মম, ধন্য হলো অন্তর।' আরেকটি গান 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ' শুনলে দেখি একটি রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীকান্ত আর আশ্রয়হীন শোকাহত কমললতা। শ্রীকান্ত তাকে সবকিছুই দিতে চান, তিনি কিছুই নেন না। ভাবি এসব ঘটনা না জানলে গানগুলো কি আমাদের কাছে এতটা হৃৎস্পর্শী হতো?

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানগুলোর উপলব্ধি নিবিড়তর গভীরতর হতে থাকে। কিন্তু ছিয়াত্তর বছর বয়সে মোটোনিউরণ রোগে আক্রান্ত একজন মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার আকুলতার ঘটনা মনে বড় বিস্ময় জাগায়। তিনি আবু সায়ীদ আইয়ুব, প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রাবন্ধিক। অন্তিম আসন্ন বুঝে শুনতে চান সাবিত্রী কৃষ্ণানের কণ্ঠে 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী' গানটি। গায়িকা ততদিনে বৃদ্ধা, থাকেন বহুদূর মাদ্রাজে। কিন্তু এমন বোদ্ধাকে নিরাশ করতে পারেন না। এলেন, গাইলেন। আইয়ুব বললেন, 'আমি তৃপ্ত, মুগ্ধ।' আজকাল সব রবীন্দ্রসঙ্গীত সমান ভাল লাগে না, অসুস্থতায় এই পারক্যবোধ আরও বাড়ে। আগে যেসব গানের সুর পর্যায়িকভাবে অবিরাম কানে বাজত, আজকাল তাতে বড় বড় ছেদ পড়ে। আমি ভয় পাই। তবে কি আরও অধিক বয়সে রবীন্দ্রনাথ আমাকে ত্যাগ করবেন? আমি তখন কী নিয়ে বাঁচব? তাই এই আর্ত মিনতি, 'চিরসখা ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।'



রবীন্দ্রনাথ কেন?

আমার পাঠক, কনিষ্ঠ বন্ধু, এমন কি টি-ভি সাক্ষাৎকারে প্রশ্নকর্তারাও জিজ্ঞেস করেন আমি এতটা রবীন্দ্রগ্রস্ত কেন? আমার বইয়ের নামে, প্রবন্ধের নামে, লেখার ছত্রে ছত্রে থাকে রবীন্দ্রকবিতার পঙক্তি এবং উক্তি ও শব্দবন্ধ। সবই সত্য। মস্কোয় অনেক বছর ছিলাম। আমার বন্ধু সিয়ের্গেই সেরিব্রিয়ানি সংস্কৃত হিন্দি বাংলা তিনটি ভাষাই ভাল জানেন, পেশায় অনুবাদক, বাংলা কবিতা ও গল্প রুশীতে অনুবাদ করেছেন। তিনিও একদিন প্রশ্ন করেন — 'রবীন্দ্রনাথ তোমাদের কে?' রুশ-সাহিত্যের পর্যাপ্ত বঙ্গানুবাদের সুবাদে আমরা ওই সাহিত্য-জগতের পরিচয় কিছুটা হলেও জানি, তাই বলতে পেরেছিলাম — পুশকিন তোমাদের যা, রবীন্দ্রনাথও আমাদের তাই। তিনি বাঙালিকে আধুনিক বানিয়েছেন।' সিয়ের্গেই আর তর্ক করেন নি।

কিন্তু বোদ্ধা বাঙালিকে ব্যাপারটা বোঝানো ততটা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বগ্রাসী প্রতিভার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রতিবাদী ধারা জন্ম নিয়েছে এবং এই কবি ও কথাসাহিত্যিকরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জনও করেন যাদের রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই এযুগে কারও রবীন্দ্রনিমগ্নতা নিয়ে প্রশ্ন-ওঠা স্বাভাবিক।

আমি কবি নই, কথাসাহিত্যিক নই। নগণ্য এক প্রাবন্ধিক, যৌবনে সুধীনদত্তীয় গদ্য লিখতাম, পরে যথানিয়মেই আমার লেখায় কোমলতা ও নমনীয়তার অনুপ্রবেশ ঘটে, কিশোরদের জন্যও লিখতে হয় এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ আমার ওপর আছর করে যেজন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় খুঁজতে হয়। যে-কথা সহজে বলতে পারি না, দেখি রবীন্দ্রনাথ কেমন অবলীলায়, কী আশ্চর্য দক্ষতায় তা পারেন। একটি কিশোর-মাসিকের সম্পাদক তাদের বৃক্ষসংখ্যার জন্য আমার কাছে একটি লেখা চান। একটি গল্প লিখি এবং লেখাটি ভাল হয়েছে এমন একটা বোধ আমাকে কিছুদিন আনন্দও যোগায়। কিন্তু পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে দেখি আমার গল্পটির পরেই আছে রবীন্দ্রনাথের 'বলাই'। বহুবার পড়েছি, নিজের অনেক লেখায় অংশবিশেষ উদ্ধৃতও করেছি, তবু আবার পড়ি, তুলনার দুর্বলতা এড়াতে পারি না সম্ভবত এজন্য যে দুটি গল্পেরই বিষয়বস্তু ছিল খুব কাছাকাছি। কিন্তু, বুঝতে দেরি হল না যে আমার গল্পটি একটি কংকাল মাত্র আর 'বলাই' একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণবন্ত জীব। এ কোন নতুন উপলব্ধি নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে যখনই লিখি তখনই

তাঁকে স্মরণ করি। তিনি আসেন, আমাকে অভয় দেন, আমি বার বার নত হই তাঁর সামনে। আমি কি লিখতে পারি 'জীবনলতা অবনতা'? 'বলাই' তো আমাকে নিরন্তর ভাবায়, প্রকৃতি ও মানুষের আন্তঃসম্পর্কের এমন নান্দনিক কথার দার্শনিক অথচ শিশুতোষ ভাষ্য বিশ্বসাহিত্যে দ্বিতীয়টি আছে কি? জানি, আমাদের এখনকার স্কুলপাঠ্য বইয়ে লেখাটি আছে, তবু একটা উদ্ধৃতি দেবার লোভসংবরণ করা গেল না "এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেরকার দিনে, সেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে — যেদিন পশু নেই পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারদিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্র-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে; পৃথিবীর অমৃত ভাণ্ডারের জন্য প্রাণের তেজ, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব'।" আমার একটি স্বপ্ন ছিল অরণ্যের অবহেলিত বৃক্ষের একটি জার্মপ্লাজম কেন্দ্র গড়ে তোলা, বনবিভাগের কাছে যাদের কোন মূল্য নেই। সম্প্রতি চা-বাগানের জনৈক মালিকের ঔদার্যে সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ভেবেছি, সেই বনের প্রবেশপথে একটি সাইনবোর্ডে রবীন্দ্রনাথের ওই কথামালা লিখে রাখব।

আর 'বনবাণী'? কোন তুলনা আছে গোটা বিশ্বের প্রকৃতি-সাহিত্যে? এবার আরেকটি উদ্ধৃতি 'আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি/মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি/তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্তি/আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি। দিয়েছে সাহস, তাই তব নীলবর্ণে/বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে/তরুতরুণের করুণায় করো ধন্য,/দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য।' একদা 'গ্রিন পিস' সংস্থার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। তাদের 'বনবাণী' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ প্রচারের কথা লিখেছিলাম। কোন সাড়া মেলে নি। নৃকেন্দ্রিক সভ্যতার মানুষেরা যুক্তির সাহায্যে সব সমস্যার সমাধান চান। কিন্তু ইদানিং দেখছি আধুনিক পশ্চিমা চিন্তকরা, বিশেষত বাস্তুসংস্থানবাদী লেখকদের কেউ কেউ প্রাচ্য দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তার নিরিখে যন্ত্রসভ্যতার সংকটকে বিচার করছেন, অনৃকেন্দ্রিক হয়ে উঠছেন এবং প্রায় বলতে শুরু করেছেন 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর/হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী হে নবসভ্যতা।' কিন্তু তারা কি জানেন রবীন্দ্রনাথ তাদের অগ্রণী পরিবেশবাদী? তিনি যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একটি পরিবেশ-সঙ্গীতের (আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ/তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান/বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।) রচয়িতা? হয়ত জানেন না। তাতে ক্ষতি নেই। বিলম্বে হলেও তাদের বোধোদয় ঘটছে এটাই আশার কথা।

আবার নিজের কথায় ফিরি। আমি উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র, শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্ব আমার প্রিয় বিষয়, সেজন্য উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থানের খুঁটিনাটি খোঁজি। এ কাজে ব্যস্ত থাকার সময় হঠাৎ যখন মনে পড়ে 'ফুলগুলি যেন কথা, পাতাগুলি তার চারদিকে যেন পুঞ্জিত নীরবতা', তখন আমার বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে আরেকটি মাত্রা যুক্ত হতে চায় যা মোকাবিলা বড়ই কঠিন হয়ে ওঠে। কোন পদার্থবিদ 'নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ' গানটি শুনলে তিনিও আমার এই বিস্রস্ত অনুভব এড়াতে পারবেন না। আমি কোন ছার, আচার্য জগদ্বীশচন্দ্রও পারেন নি, যেজন্য তাঁর প্রাণবিজ্ঞানের তত্ত্বকে একদা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন ভারতীয় ভাববাদ বলে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে তিনি ভ্রান্ত প্রমাণিত হন। কট্টর বিজ্ঞানীদের এ সংকট সি পি স্নো উপলব্ধি করে থাকবেন, তাই তিনি তাঁর 'টু কালচার' বক্তৃতায় বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার মেলবন্ধনের আবশ্যিকতার কথা বলেছিলেন। স্নো'র উপদেশ মান্য করলে বাঙালি বিজ্ঞান-লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে এড়াবেন কীভাবে?

অগ্রজের আত্মজীবনী ও আনুষঙ্গিক

অগ্রজের আত্মজীবনী রচনার পটভূমির যৎসামান্য ভূমিকার সূত্রেই এই মুখবন্ধের অবতারণা। দু'দশক পর পঁচাশির গ্রীষ্মে বাড়ি ফিরছিলাম। ইতোমধ্যে জন্মদাত্রী লোকান্তরিতা, অগ্রজ বার্ধক্যকাতর এবং আমিও প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে উপনীত। সিলেটের কুলাউড়া স্টেশনে ট্রেনবদলের পর একটি কামরায় দাঁড়ানোর ঠাঁই পেয়ে বর্তে যাই এবং উপবিষ্ট কমবয়সীদের কেউ আমাকে আসন ছেড়ে দেয় নি দেখে স্বস্তি বোধ করি। কেননা আমার জন্য তখন এই বিচ্ছিন্নতাটুকু বড়ই জরুরি ছিল। দিনটি সোমবার, পূর্বনির্ধারিত, স্থানীয় বাজারবার। কোন পোঁটলাপুঁটলি সঙ্গে নেই, কাঁধে একটিমাত্র ঝোলা। ভেবেছি সরাসরি চলে যাব হাটে। চিনবে না কেউ আমাকে, মিশে থাকব ভিড়ে, ঘুরে বেড়াব তালপাকান দোকানপাটের অলিগলিতে। আনাজহাটায়, মাছহাটায়, কেরোসিনের কুপির কাঁপাকাঁপা আলো আর হট্টগোলের রোল ঠেলে ঠেলে খুঁজব লেংড়া প্রতুলের তামাক বিক্রির দোকানটির ভিটে, যেখানে বাবা একদা তার ঢাউস খালইটি রাখতেন। যাব সেই মহীরুহ রসালের তলায় যেখানে স্থানীয় জমিদার রাজেন্দ্রবাবু সাইকেলে ভর দিয়ে নিয়মিত দাঁড়াতেন, দেখব মুর্গিহাটার সেই কোণটি যেখানে ইনাই চাচা, মুন্সী চাচা ডিম নিয়ে বসতেন। কিন্তু শিলীভূত এই স্মৃতিভুবনে খোঁড়োখুঁড়ির গোটা পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। কেননা স্টেশনে নেমেই জানতে পারি আজকাল আর সোমবারে বাজার বসে না, বসে অন্যদিন। অগত্যা বাড়ির পথ ধরি। রেল-সাইডিংয়ের ঘাটা পেরিয়ে আমাদের পাঠশালার সামনে দাঁড়াই। পুরনো ঘরটি নেই। এখন নতুন চৌচালা। আম আর কাঁঠাল গাছগুলো আছে। হঠাৎ যেন শুনতে পাই আমাদের কৈশোরের কলরব। মাখমদ চেচাচ্ছে 'এক এক এক, দুই একে দুই।' তারপর তার সঙ্গে কথা বলে বলে হাঁটি, পেরোই জগীবাবুর শূন্য ভিটে, বিরান সাঝিপাড়া এবং শেষে বারোয়ারি গোরস্থান মোকামঘাটে পৌঁছে মাখমদ হঠাৎ মিলিয়ে যায়। ভাবি বেঁচে আছে তো? আমি আবারও পিয়ারি ও রমেশের শূন্য ভিটে পেরিয়ে শেষে আমাদের পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াই। কৈশোরের সরোবরকল্প জলাশয়টি এখন দন্তহীন থুবড়ান মুখের মতই বেঢপ। পার ধসে গেছে, ঘাটের শানগুলো তছনছ, এককালের কাকচক্ষু জলে ছানির অনচ্ছতা। উত্তর দিকটায় খানিকটা জায়গা ঘিরে বেড়ে-ওঠা নাগেশ্বর, বকুল ও চাঁপার জড়াজড়িতে যে অনন্য

বাগিচার আদল দেখে গিয়েছিলাম সেখানে আজ হাঁ-মুখ শূন্যতা। গাছগুলো ঢেঙা লকলকে, তলাটা বিশ্রী রকমের ফাঁকা ফাঁকা। সর্বত্র সবকিছু ছেঁড়াখোঁড়া, অবিন্যস্ত, সৃষ্টিছাড়া।

সন্ধ্যা নামে। বাড়ি ঢোকার পথটি খুঁজে পাই না। অগত্যা ঝোপঝাড় মাড়িয়েই জন্মভিটেয় পৌঁছাই। এখানেও স্মৃতিখোয়ানোর বিষাদ। ঘরগুলোকে যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো আর সেখানটায় নেই। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। অন্ধকার জমাট বাঁধে। আমি হাতড়ে হাতড়ে স্মৃতির টুকরা-টাকরা খোঁজি। পামগাছটিকে চিনতে পারি, একটি অষ্টবক্র কাঠগোলপকেও। ছাত্রজীবনের শেষ আস্তানা ঢাকা হলের স্মৃতি। রঙ্গন, গন্ধরাজ, রাধাচূড়া গেছে, একেবারেই গেছে। কিন্তু দুর্মর মধুমঞ্জরী? একবার ছুটি ফুরানোর শেষদিনে তার ডালে কলির ঢল নামলে ফুল ফোটানোর খেলা দেখতে পাব না বলে দুঃখ হয়েছিল এবং তখনই সেই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং ফুলফোটা শেষ হলে তবেই কর্মস্থলে ফিরি। কতদিন ভেবেছি সে কি আমার আসন্ন অসুখ আঁচ করেই ফুল ফোটানোর দিনক্ষণ ঠিক করেছিল?

'খুকা নি?'

দক্ষিণের ভিটের গহন থেকে অগ্রজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। অতঃপর তাকে দেখি ন্যুব্জ শরীর, কোটরগত চোখ, বুক অবধি ঝুলন্ত একগুচ্ছ কাঁচাপাকা দাড়ি। বড়ই অচেনা লাগে। তিনি এগিয়ে আসেন — খালি গা, পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট।

'আইচ্ছা কওচাইন খুকা, ঈশ্বর আছইন নি?'

আচমকা অভাবিত এমন প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না। বৃথাই জ্ঞানবুদ্ধির তহবিল হাতড়াই। তারপর 'আছইন আছইন' এমন কিছু স্বগতোক্তির পর আমাকে হতবাক করে হঠাৎ গেয়ে ওঠেন 'কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘষিলে সৌরভময়।' রাশভারী এই মানুষটিকে কোনদিন সুরেলা বাক্যবদ্ধ উচ্চারণ করতে শুনি নি। আমি চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলি আর তিনি ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দ অন্ধকারে পায়চারী করেন পিতৃপুরুষের প্রাচীন ভিটেয়।

পরদিন গাঁ বেড়াতে বেরই। গাঁয়ের গলা-জড়ান নদীটি এখন মৃতা, মূলস্রোত দিকবদল করেছে অনেকদিন। পুরান খাত, ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু ঘোঁড়ল-খোদলের এই কঙ্কালটিও এখন গ্রামবাসীদের বুভুক্ষায় লুপ্তপ্রায়। পাড়ায় ঢোকি। শূন্য ভিটেগুলোতে গণকবরের স্তব্ধতা। কৈশোরে নিত্য ফুলসন্ধানের এই রম্যকাননটি ফুলহীন, ধ্বস্ত। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত হাঁটি। খালি বাড়ির হাহাকার আমাকে তাড়া করে। বিলাপধ্বনির মতো একটি গানের রেশ যোজন ও যুগান্ত পেরিয়ে কানে পৌঁছায় 'ওমা যাইত্রায় গিনি গো আমরারে কান্দাইয়া।' বিজয়াদশমীর ভাসানগান। প্রতিমা-বিসর্জনার এই শোকাকুল শোভাযাত্রার শরিকদের সঙ্গে আমিও হেঁটেছি অনেককাল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের দৃষ্ট দেহগুলো ছেঁড়াখোঁড়া। বড়ই যন্ত্রণাকর এই পরিক্রমা। পঞ্চাশের পর যেদিন গোটা গ্রামটি

আমাদের ফেলে ভিনদেশে ঘর বাঁধতে গেল সেদিনও বুঝি নি যে ওদের সঙ্গে উধাও হওয়া স্মৃতির সিংহভাগটি খুইয়ে আমরাও নিঃস্ব হতে চলেছি। এখন জানি উত্তরাধিকারের এই ভাঙন আখেরে কতটা উষর ও বন্ধ্যাগর্ভ। অগ্রজ তার নির্মম বলি, অংশত আমিও, হয়ত-বা আমাদের গোটা প্রজন্ম।

কিছু দুর্বল ছোটগল্প নিয়েই সাহিত্যভুবনে আমার প্রবেশ। কৈশোর-স্মৃতির গোটা জগৎটি অটুট থাকলে এই শীর্ণা স্রোতস্বিনী এখানকার জনজীবনের পাললিক অববাহিকায় হয়ত-বা একদিন মহানদীর ব্যাপ্তি ও গভীরতা পেত এমন একটি ভাবনা আমাকে প্রায়ই আবিষ্ট করে। তাই গাঁয়ের ওইসব লোকের সামান্য কিছুটা ইতিবৃত্ত লিখতে অগ্রজকে অনুরোধ করি, যাতে প্রবাসে স্মৃতিকাতরতার মুহূর্তে কৈশোরভুবন পরিক্রমায় আমাকে অযথা পথ হাতড়ানোর দুর্ভোগ পোহাতে না হয়। তিনি কিছুই বলেন না এবং আমিও অনিশ্চিত থেকেই আপন কর্মস্থলে ফিরি। আশির দশকের শেষে তাঁর হাতে লেখা খাতার পার্শেলটি পেয়ে তাই বড়ই বিস্মিত হই এবং তখনই সেটি পড়তে বসি। না, অগ্রজ আমার অনুরোধ ততটা মান্য করেন নি। গ্রামবাসীদের উল্লেখ তাতে সামান্য। লিখেছেন আত্মকথা, নিজেকে মেলে ধরেছেন অসংকোচ দুঃসাহসে, শিল্পীর অব্রণ নিষ্ঠায়, দার্শনিক নির্মোহে। লেখাটি তার সত্তরোর্ধ্ব বয়সের, তবু তাতে জরার ছায়ামাত্র নেই। আছে সোচ্চার যৌবন আর সেটাই আশ্চর্যের। অগ্রজের কোন মুদ্রিত রচনা নেই, হাতে-লেখা প্রবন্ধ ও কবিতার খাতাগুলো একাত্তরের আগুনে ভস্মসাৎ, তাই বলাই বাহুল্য, এটিই তাঁর শেষ লেখা, তার প্রজন্মের একাংশের করুণ পরিণতির ইতিবৃত্ত।

আমার গোটা যৌবন আমি অগ্রজের শুধু অস্থির পদচারণাই দেখেছি। পিতা প্রয়াত, গোটা গ্রামটি দেশান্তরি এবং মায়ের 'পদমেকং ন-গচ্ছামি' সিদ্ধান্তে আটক তিনি বিভ্রান্ত। কৈশোরবান্ধব ত্রিপুরারাজ্যে বসতি গাড়লে অগ্রজ তার লাগোয়া স্বদেশের সীমান্তে একখণ্ড ভূমি খরিদ ও একটি গৃহনির্মাণ করেন। দুই বন্ধু দুই দেশে, মাঝখানে নাতিবৃহৎ নদী, তীরে দাঁড়িয়ে নিত্য আলাপ। কিন্তু এমন স্বপ্ন তো বাস্তববিরুদ্ধ। স্বগ্রামের সংসার, জমিজিরাত, পৈতৃক কবিরাজি ব্যবসা ইত্যাকার জরুরি চাহিদার চাপে তাই বন্ধুসান্নিধ্যে ক্রমাগত বিঘ্ন ঘটে, অনুপস্থিতির মেয়াদ বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত জায়গাটিও বেহাত হয়ে যায়।

একাত্তরে, প্রায় একযুগ পরে অগ্রজের সঙ্গে দেখা তাঁর ওই বন্ধুগৃহেই। চাদরমুড়ে জলচৌকিতে বসেছিলেন, মুখে কাঁচাপাকা খোঁচাখোঁচা দাড়ি, জবুথবু চেহারা, ছেলেবেলায় ঝোপের অন্ধকারে দেখা যেন সেই ডানাভাঙা শাহবাজ, ঘোলাটে চোখে অবিকল সেই আর্ত বিষণ্ণতা।

'তা হলে শেষ পর্যন্ত এলে বন্ধুর বাড়ি। থেকেই যাও এখানে' — তাকে বলি। তিনি মুচকি হাসেন। দিন যায়। বিশেষ কথাবার্তা হয় না। দেখি দুই বন্ধু প্রায় সর্বদাই নীরবে মুখোমুখি বসে থাকেন। কখনও হেঁটে বেড়ান তাঁরা উঠোনে, খেতের কিনারে, নদীর

পারে, তেমনি নির্বাক। একদিন শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বাইরে এসে দেখি অগ্রজ একা নদীর কিনারে, তাকিয়ে আছেন সীমান্তের ওপারে। নিস্তব্ধ চরাচর, নদীটিও অনড়, দূর থেকে ভেসে আসে একটি রাতজাগা পাখির ডাক। আমাকে দেখে বলেন, 'যাইতাম গিয়া ব্া, ধান পাকার সময় তো আইছে।' শুনে আঁৎকে ওঠি।

'ঈনো কিচ্ছু ভালোলাগে না। না মাটি, না পানি, না গাছগাছালির রঙ।' তাঁকে বোঝাই, নিশ্চিত মৃত্যুর ভয় দেখাই, শোনেন কি না সঠিক প্রতীয়মান হয় না। নদীতীরে আনমনে পায়চারী করেন যেন নিশিতাড়িতের নিদ্রাভ্রমণ।

আত্মজীবনী লেখার পর কয়েক বছর অতিক্রান্ত। অগ্রজ এখন অশীতিপর। সম্প্রতি ভ্রাতৃজায়ার এক চিঠিতে জেনেছি সর্বদা স্বল্পবাক অগ্রজ অনবরত কথা বলেন, রোগীপত্র দেখেন না, দিনের বেশিরভাগ পুকুরপারের তালতলায় শুয়ে-বসে কাটান, সর্বদা উৎকর্ণ থাকেন, কার যেন প্রতীক্ষায় আছেন, ট্রেনের শব্দ শুনলে স্টেশনের দিকে কিছু দূর ছুটে যান, আবার একাই ফেরেন — এই চলছে ইদানিং।



মধুময় পৃথিবীর ধূলি

মস্কোয় হেমন্তশেষের দিনগুলো যখন ছোট হয়ে আসে, রৌদ্রহীন গুমট আকাশ বিষণ্ণতা ছড়ায়, তুষার ঝরে ও গলে পথঘাট কাদায় ভরে তোলে তখন আমার মতো কর্মহীন বয়স্ক লোক যাদের ঘরে বসে থাকতেও ভাল লাগে না আবার বাইরে যেতেও ইচ্ছে করে না, তাদের জন্য বড়ই দুঃসময়। এমনই এক দিনে পুরানো খাতাপত্রের বান্ডিল ঘাটতে ঘাটতে পেয়ে যাই ঢাকার সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজ বার্ষিকীর রজতজয়ন্তী সংখ্যা। পাতা উল্টাই, লেখাগুলো পড়ি, ছবিগুলো দেখি, কতক চেনামুখ কতক অচেনা, অচিরেই স্মৃতিকাতরতায় আক্রান্ত হই এবং অবশিষ্ট নিত্যকর্ম সবই মুলতুবি হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে মস্কো আসি আর আজ ২০০৩ সালের নভেম্বর, সময় তো একঠাঁই বসে নেই, পদ্মা ও ভলগা দিয়ে কত জলই বয়ে গেছে। ইতোমধ্যে সহ-অধ্যক্ষ রোকেয়া খাতুন, অধ্যাপক আবদুল মতিন, আহমেদ হোসেন, অমূল্য বিশ্বাস পরলোকে, কলেজের জন্মলগ্নের কর্মী আব্দুল গণিও নেই, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষা বেগজাদী মাহমুদা নাসির অবসর নিয়েছেন — এটুকুই আমি জানি, কিন্তু আরও কে কে কলেজে নেই, হয়ত পৃথিবীতেও নেই, তা জানি না। ভাবলাম রজতজয়ন্তীতে স্মৃতিচারণের সুযোগ হারিয়েছি, সুবর্ণজয়ন্তী পর্যন্ত ঝুঁকি নেয়া নিশ্চিত নির্বুদ্ধিতা, তাই এই অকালবোধন, অসময়ে রচিত এই পঙক্তিমালা।

১৯৬৪ সালে সম্ভবত যে বছর বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হল সে বছরই আমি উদ্ভিদবিদ্যার খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজে যোগ দেই। ঢাকার নটেরডেম কলেজে পড়াতাম। সহকর্মী রসায়নের অধ্যাপক সুশীল সাহা লালকুঠিতে নিয়ে আসেন। জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থা, কিন্তু পরিবেশ বড়ই অন্তরঙ্গ, ঠাসবুনানি পরিবারের মতো। প্রিন্সিপাল আপা, রোকেয়া আপা, আফসারুন্নেসা আপা, ইপতি আপা, মতিন সাহেব অচিরেই আপন করে নিলেন। আমাদের সকলেরই তুলনামূলক বয়স কম, সকলেই উচ্ছল প্রাণবন্ত, নিত্যদিন কত তর্কবিতর্ক হাসিতামাশা, উদ্দীপ্ত আনন্দস্নাত হয়ে বাড়ি ফেরা — আজ সবই স্মৃতিমাত্র।

ঢাকা শহরসহ দেশের সর্বত্র এখন কত কলেজ, গ্রামেগঞ্জেও আছে আর সবই স্বাধীনতার কল্যাণে। ব্রিটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে এদেশে কলেজ ছিল খুবই কম, আজকালকার বৃহত্তর জেলাগুলোর প্রত্যেকটিতে সাধারণত একটিমাত্র আর নতুন কলেজ

প্রতিষ্ঠাও ছিল অসাধ্যসাধন। তাই মতিন সাহেবের কাছে সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজ প্রতিষ্ঠার জল্পনা শুনে জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ খানবাহাদুর আব্দুর রহমান খান বলেছিলেন, 'কাদের মাথায় এসব পাগলের চিন্তা এসেছে? মানা কর এসব করতে। কলেজ করতে কী লাগে তারা জানে?' তিনি সত্যকথাই বলেছিলেন এবং সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা মোটেই সহজ হয় নি। একদল স্বাপ্নিক এই দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হন যাদের মধ্যে ছিলেন বেগজাদী মাহমুদা, আবদুল মতিন, ড. মীর্জা নুরুল হুদা ও বেগম কুলসুম হুদা, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) ও বেগম আফিয়া হক প্রমুখ। সবই ১৯৫৫-৫৬ সালের ঘটনা। ফজলুল হক তখন পূর্ববাংলার গভর্নর। তাঁকে কলেজের পৃষ্ঠপোষক হতে বলা হলে তিনি জানান 'আমি এতে রাজি নই। আমাকে প্রেসিডেন্ট বানাও। আমি কলকাতার মতো লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ তৈরি করে দেব। তারপর সেটা মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় হবে।' হক সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি, সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজ আজ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ও।

কলেজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সালে বাংলাবাজার গার্লস স্কুলে। সকালে ক্লাস করার সুযোগ করে দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা লুৎফুন্নেসা চৌধুরী। স্কুলের এসেম্বলি হলে টিনের এক সাইনবোর্ডে কলেজের নাম লিখে সেটা ঢেকে রাখা হয়েছিল শাড়ি দিয়ে। শেরেবাংলা ফজলুল হক সুতা টেনে শাড়ি সরিয়ে কলেজের নামফলক উন্মোচন করলে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান শেষ হয়। শুরু হল দুর্গম পথে কলেজের যাত্রা। এক বছরের মধ্যে আবার ঠাঁইবদল। এবার নারিন্দার রেললাইনের পাশে দয়াগঞ্জে শক্তি ঔষধালয়ের পড়োবাড়ি। বহুলোকের এই আবাসে দুটি ঘর ও এক চিলতে বারান্দা নিয়ে কলেজ। মতিন সাহেব লিখেছেন, 'বাসিন্দাদের রান্নার ঝাঁঝে মেয়েরা ক্লাসে হাঁচতে শুরু করত চারিদিকে দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্বল ছিল কাঠের তিনটি ব্লাকবোর্ড ও ফার্নিচারের দোকান থেকে সস্তায় ভাড়া করে আনা হাতলছাড়া কিছু চেয়ার। হাইবেঞ্চ বা টেবিল ছিল না। মেয়েরা হাঁটুর ওপর খাতা রেখে লিখত, কিন্তু কোন অনুযোগ করত না।'

১৯৬০ সালে কলেজ গেল শেষ অস্থায়ী গন্তব্যে — ফরাসগঞ্জের লালকুঠি। সেইসব দিনের চমৎকার বর্ণনা আছে অধ্যাপিকা আফসারুন্নেছার লেখায় 'মস্ত হলঘরটায় চটের পর্দা দিয়ে চারটে খোপ তৈরি করা হয়েছে। দুটোতে দুই ইয়ারের ছাত্রীদের ক্লাস, অপর দুটোর একটি মেয়েদের কনমরুম, অন্যটি লাইব্রেরি। ক্লাসের সময় প্রায়ই একটা মজার ব্যাপার ঘটত এক ক্লাসে আমি যখন খুব আবেগভরা স্বরে পড়াতে আরম্ভ করেছি — যুগ যুগ ধরি হাম রূপ নেহারিনু, সেই মুহূর্তে পাশের ক্লাসে করিম কাংস্যকণ্ঠে গর্জে উঠেছেন economics is a social science ...তপ্ত মধ্যাহ্ন, পাখার ব্যবস্থা নেই, ঘেমে সবাই একাকার, কিন্তু হার মানতুম না আমরা।'

উদ্যোক্তারা অবশ্য বসে থাকেন নি, তারা কলেজের জন্য জুৎসই জায়গা খুঁজছিলেন এবং পেয়েও যান তারাবাগে, ভোলাগিরি আশ্রমের উল্টোদিকে। ১৯৬৪ সালে সেখানে কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন খানবাহাদুর আব্দুর রহমান খান, যিনি একদা

উদ্যোক্তাদের বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১ নভেম্বর নতুন ভবনে ক্লাস শুরু হল। ইতোমধ্যে ঢাকার পথতরুর ইতিবৃত্ত লিখে এবং নটরডেম কলেজ চত্বরে গাছপালা লাগিয়ে আমার বাগান তৈরির নেশা ধরেছে। ক্লাসের পর খালি মাঠে হেঁটে বেড়াই, কখনও দোতলার বারান্দা থেকে জায়গাটার উচ্চাবচ দেখি, বাগানের নানা নকশা মাথায় ঘোরে, কিন্তু এজন্য অর্থের প্রয়োজন যা কলেজের নেই। একদিন কলেজে আসার সময় দেখি ড্রেন খুঁড়ে পথের পাশে প্রচুর মাটি জমিয়ে রাখা হয়েছে যা নিতে চাইলে নেয়া যায়। প্রিন্সিপাল আপাকে বললাম এবং আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কী ভেবে ৩০০ টাকা দিতে রাজি হয়ে গেলেন। আমি বালকের মতো আনন্দে লাফাতে লাফাতে তখনই ট্রাক খুঁজতে বেরিয়ে গেলাম। এভাবেই কলেজচত্বরের বাগানের সূত্রপাত।

চারপাশে মাটি ফেলে উঁচু করে মাঝখানে লন নিচু রেখে বাগানের একটা কাঠাম বানান গেল। লনটি ছিল রঙের প্যালেটের আকৃতির ইনফর্মাল গড়নের, কিন্তু ওপর থেকে অধ্যাপিকা আফসারুন্নেসা দেখে বললেন হয়েছে 'পাঠরতা বালিকার আকৃতি'। আমরা মেনে নিলাম। টাকাকড়ির টানাটানি, তাই গাছপালা জোগাড় করতে হল বলে-কয়ে, নিখরচায়। পাওয়াও গেল। বলধা বাগানের অমৃত লাল আচার্য দিলেন কম্ব্রেটাম লতা, বরিশাল থেকে প্রকৃতিবিদ ডা. এম আহমেদ পাঠালেন নাগলিঙ্গম, নটরডেম কলেজ থেকে আনা হল পান্থপাদপ, রমনাপার্ক থেকে মাধবী এবং বেলি রোডের বনবিভাগের নার্সারি থেকে নামমাত্র মূল্যে কৃষ্ণচূড়া, পেল্টোফরাম, চাঁপা, নাগেশ্বর, অশোক, বিলাতী জারুল, গগনশিরীষ, কদম ও মিলেশিয়ার চারা। ড. হুদা তখন পূর্ববাংলার অর্থমন্ত্রী, থাকেন মিন্টো রোডে, একদিন প্রিন্সিপাল আপার সঙ্গে গেছি তাঁর বাড়ি। কুলসুম হুদার ছিল গাছপালার সখ, দেখি টবে 'মেরি পামার' জাতের বাগানবিলাসের একটি কলম, চাইলাম কলেজের জন্য, সানন্দে এগিয়ে দিলেন। এই কাষ্ঠলতা অধ্যক্ষার অফিসের সামনের পিলারে দু'তলা পর্যন্ত উঠে বহুকাল শীত-বসন্তে বেগুনি ও সাদা ফুলের অপূর্ব শোভা ছড়িয়েছে। গতবছর দেখিনি, হয়ত মারা গেছে। বাগানের জন্য গণি খুব খেটেছিল আর মতিন সাহেব ছিলেন সার্বক্ষণিক উপদেষ্টা।

বাগানের উত্তর সীমানায় দালানের ফাঁকা তলার সামনে আমরা এক সার স্বর্ণচাঁপা লাগাই। চারাগুলো তরতরিয়ে বেড়ে দু'তিন বছরের মধ্যে দু'তলার কাছাকাছি পৌঁছায়। এক গ্রীষ্মের ছুটির আগে কী এক অনুষ্ঠানে ড. কুদরাত-এ-খুদা প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। কলেজে গিয়ে দেখি চাঁপাগাছে ফুল ফুটেছে আর এক আশ্চর্য মধুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সারা কলেজে ঢেউয়ের মতো, ঢলের মতো। চাঁপার সঙ্গে আমার আশৈশব পরিচয়, কিন্তু এতগুলো গাছে এতটা ফুলের এমন সমারোহ এই প্রথম দেখলাম। বাগানে কয়েকটি নাগেশ্বরও ছিল, ভারি সুশ্রী গড়ন। চাঁপা ও নাগেশ্বর সবই মারা পড়ে ১৯৭৪ সালের বন্যায়। দক্ষিণের দেয়ালের পাশের পেল্টোফরাম গাছগুলো এখন বিশাল, ছায়া বিছিয়েছে বাইরের রাস্তার ওপর, কত শ্রমজীবী মানুষ গরমের সময় সেখানে আশ্রয় পায়, বিশ্রাম নেয়। অধ্যক্ষার বাসভবনের ওদিকে আছে অশোক, মিলেশিয়া, বিলাতী জারুল,

নাগলিঙ্গম এবং মাধবী লতার বিশাল ঝাড়, নিশ্চয়ই প্রতিবসন্তে নাগলিঙ্গম আর মাধবীর সুগন্ধে গোটা এলাকা ভরে থাকে।

আমি ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে মস্কোর 'প্রগতি প্রকাশন' সংস্থায় অনুবাদকের চাকরি নিয়ে রাশিয়া চলে আসি। কাজকর্ম ও বসবাসের পরিবেশ সবই চমৎকার ছিল, কিন্তু কিছুই ভাল লাগত না। দিনের একটা বড় অংশই কেটে যেত দেশের কথা ভেবে আর রাতে স্বপ্ন দেখতাম কলেজে গেছি কিন্তু নাম-ডাকার রেজিস্ট্রিখাতা বা ক্লাসরুম খুঁজে পাচ্ছি না কিংবা ভুল ক্লাসে ঢুকে পড়েছি, তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেলে অনেকক্ষণ স্মৃতিকাতরতার দুঃখভোগ। প্রবাসী শিক্ষকের আরেকটি দুর্ভাগ্য এখনও বয়ে চলেছি এবং তা হলো ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া। একদা যাদের পড়িয়েছিলাম সেই ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ ছায়ার মতো স্মৃতিতে ভেসে বেড়ায়, সবই আবছা, তাদের চেহারা নাম সবই ভুলে গেছি অথচ তারা সম্পূর্ণ বিলীনও হয় নি, মাঝে মাঝেই ফিরে ফিরে আসে, তাদের চিনতে চেষ্টা করি, পারিনা। সেও আরেক লাগাতার অস্বস্তি।

১৯৮১ সালে জানুয়ারি মাসে ছুটিতে দেশে ফিরে কলেজে গিয়ে দেখি গোটা বাগানটি মস্ত এক জঙ্গল হয়ে উঠেছে। গণিকে বকাঝকা শুরু করলে সে সবিনয়ে জানায় যে আমি না আসা পর্যন্ত অধ্যক্ষা গাছের ডালপালা ছাঁটতে তাদের নিষেধ করে দিয়েছেন। আমার আর গণির গোটা একটা ছুটির দিন লেগেছিল বাগানটি ঠিকঠাক করতে। গণি নেই, মতিন সাহেবও চলে গেছেন, প্রিন্সিপাল আপা অবসরে, বাগানটি এখন বড়ই মলিন আর ছেঁড়াখোঁড়া, মাঝে মাঝে ভাবি নতুন অধ্যক্ষাকে বাগানটি নতুনভাবে তৈরি করতে বলি, নিজে সাহায্যের হাত বাড়াই, কিন্তু কিছুই আর হয়ে ওঠে না।

আফসারুন্নেসা আপা, ইপতি আপা, রোকেয়া আপা, মতিন সাহেব, আহমদ হোসেন, অমূল্য বিশ্বাস, আব্দুল গণি কাউকেই ভুলি নি, কিছুই ভুলি নি। অবাঙালি শিক্ষিকা রোবাবা জাফরের কথা মনে পড়ে। ছোটখাটো মানুষ, ভারি চটপটে, ইংরেজি পড়াতেন, সবার সঙ্গেই হৃদ্যতা। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় দেখি বাংলা বর্ণমালা পড়ছেন, তাও আবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। শেষে আর এদেশে থাকেন নি, একাত্তরের আগেই করাচী চলে যান। কলকাতা থেকে পূর্ববাংলা হয়ে শেষে করাচী, একজন্মে এতবার ঠাঁইবদল, বিষয়-আশয় ও স্মৃতিসম্পদ হারানোর এই বেদনা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

মনে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সময়, সম্ভবত জুন বা জুলাই মাসে একদিন কলেজে হাজির হই। শিক্ষিকারা আমাকে দেখতে ছুটে আসেন। সেইসব দিনে কে বেঁচে আছে আর কে নেই জানার উপায় ছিল না। সকলের নানা প্রশ্ন — কোথায় আছি, কী করছি, আমার স্ত্রী যিনি এই কলেজে দর্শন পড়ান তিনি কোথায় ইত্যাদি। এক সময় প্রিন্সিপাল আপা মধুর মার ক্যান্টিনে ডেকে নেন, চা ও পিঁয়াজু খাওয়ান, সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং শেষে এভাবে আসার জন্য প্রচুর বকাঝকা করেন, আর কোনদিন ঢাকা না আসতে বলেন। এক সময় আমি ওঠি, তিনি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেন এবং শেষে বলেন, 'যদি ভুল

করে আবার এসেই যান আর কোন বিপদ দেখেন তবে দেয়াল টপকে কলেজে ঢুকে পড়বেন, আমরা বাঁচলে আপনিও বাঁচবেন।'

মস্কো যাওয়ার আগে আমার বইয়ের সংগ্রহটি প্রিন্সিপাল আপার বাসায় রেখে যাই। বন্যার জল তখন সবে নেমেছে। কলেজ চত্বর কাদাভরা। ঠেলাগাড়ি বইপত্র নিয়ে তাদের দরজায় পৌঁছলে মতিন সাহেবও বইগুলো তুলতে হাত লাগান এবং সবকিছু সযত্নে গুছিয়ে রাখেন। চলে আসার সময় মাঝপথ থেকে ফিরে তাকিয়ে দেখি তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আর সেই দৃষ্টি আমি আজও ভুলতে পারি না। ১৯৫০ সালে ইংরেজিতে ভাল শ্রেণী নিয়ে এম.এ পাশ করে মতিন সাহেব কী আকর্ষণে কলেজেই থেকে গেলেন আমি তা নিয়ে অনেক ভেবেছি। হতে পারে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসাই পেশাবদলের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মস্কোয় বাংলাদেশের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পড়ি এবং তাকে শ্রদ্ধানিবেদন করে তখন যে সামান্য লেখা লিখি তার উদ্ধৃতি দিয়েই আমার এই স্মৃতিচারণ শেষ করছি।

'আমার চোখের সামনে ওই বিরান ভূখণ্ডের রূপবদল ঘটল: বহুতল বিদ্যাপীঠ, কলরবমুখর অঙ্গন, শ্রেণীকক্ষে বিদ্যার্থীর স্তোত্রপাঠ। ফুল ফুটল — কৃষ্ণচূড়া অশোক কনকচাঁপা। এল প্রাণিপুঞ্জ — ভ্রমর বিহঙ্গ প্রজাপতি। পূর্ণ হল নিসর্গচিত্রের বর্ণলেপ।

এই নির্মাণের মূল স্থপতিকে চিনতাম। বঙ্গভঙ্গের আগেকার মানুষ বলেই হয়ত নির্মাণে নেশাগ্রস্ত ছিলেন। ভৌতকাঠাম ও মানুষের চিত্ত নির্মাণ সন্ধিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট নির্মাণ। বিষয়চেতনা ও গতানুগতিকতায় পরিপ্লাবিত এই দেশে তাঁর দৃঢ়মূল ঋজু অস্তিত্বকে বড় বেশি ব্যতিক্রমী একরোখা মনে হত। আমি মনে মনে তাঁর একটি প্রতীক খাড়া করি। এটি শালবৃক্ষ — সুশ্রী সুদৃঢ় গগনমুখী এবং যদিও অনুপস্থিত এই নগরনিসর্গে, আছে দেশের গভীরে নিবিড় অরণ্যে। নির্মাণ মানুষী অবহেলায় কিংবা প্রাকৃতিক সংক্ষোভে ভূগর্ভস্থ হলেও কোন একদিন কোন এক প্রজন্মের প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে তার পুনরাবিষ্কার অবশ্যম্ভাবী। নির্মাতা মাত্রেই সভ্যতার বহতা প্রবাহের অন্তর্গত এবং অবশ্যই কালজয়ী। স্থপতির মৃত্যু নেই।'



গুরবে নমঃ

টাইম-মেশিনে ঢুকে ১৯৫৬-৫৮ সালের সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে ক্ষণিক থাকা গেলে যেকোন মূল্য ও চরম ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমি তা করতাম, বছর দুটি ছিল এতটাই আনন্দময় ও মুগ্ধকর, আমার শিক্ষা জীবনের সর্বোত্তম সময়। এ নিয়ে লেখা যেতে পারে দীর্ঘ স্মৃতিকথা কিংবা ছোটখাটো একটি উপন্যাসও। কিন্তু সম্পাদক এক পাতার যে-সীমানা বেঁধে দিয়েছেন তাতে এটুকুর বেশি আর কিছুই লেখা গেল না, বলতে গেলে বলা হল না কিছুই।

আশরাফুল হক স্যারকে আমরা সবাই ভয় পেতাম। উত্তর ভারতীয় চেহারার খর-মেজাজি মানুষ, সদা-অসন্তুষ্ট। বিশ্বখ্যাত কোষতত্ত্ববিদ ডার্লিংটনের এই নামী ছাত্রটি কেন এদেশে পড়ে আছেন বুঝতে পারতাম না। তাঁকে মনে হত রূপকথার অভিশপ্ত কোন রাজপুত্র, দুর্ভাগ্যের শিকার। বিজ্ঞান গবেষণায় দুর্ঘটনা ও বঞ্চনার পর্যাপ্ত অবকাশ থাকে। এমন কিছু তাঁর জীবনে ঘটেছে কিনা তেমন সন্দেহও মনে আসত। অধিকন্তু তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল তাঁর জন্য অত্যধিক উষর, আর আমরা, ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ত তাঁর মনমতো এতটা তীক্ষ্ণ ও তুখোড় ছিলাম না। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম — স্যার লামার্ক কি অন্ধ ছিলেন? একটু থমকে গেলেন, সম্ভবত উত্তরটা জানতেন না, তারপর বললেন — ঠিক জানি না, বাট বিতোভেন ওয়াজ ডেফ। এটুকু বলেই হুংকার ছাড়লেন — তোমরা বড় রুড ইংলিশ বলো আর তোমাদের উচ্চারণও ভ্যারি ব্যাড, বিতোভেনকে বলো বিটোফেন। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। বছর শেষ না হতেই অনেকটা বদলে গেলেন, আপনজন হয়ে উঠলেন, বুঝলাম রাগী ভাবটা বাহ্য, অন্তরটা কোমল, তাতে ভালবাসার ভাগ আছে যথেষ্ট। একবার ডার্লিংটনের ল্যাবে ফিরেও গেলেন। ভাবলাম এবার হয়ত গবেষণায় ডুব দেবেন। কিন্তু বছরখানেক পরেই ফিরে এলেন আর যোগ দিলেন তাঁর প্রতিভার পক্ষে উষরতর প্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। নতুন কিছু করার কথা হয়ত ভেবে থাকবেন। ঢাকায় এলে আমাদের সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় আসতেন। একবার বলেছিলেন এদেশে ভাল জাতের লেংড়া আম জন্মানোর একটা প্রকল্পের কথা ভাবছেন — কয়েক'শ বীজের চারা থেকে দু'চারটি ভাল জাত হয়ত পেয়ে যাবেন। কিছুই করেন নি শেষ পর্যন্ত, জড়িয়ে পড়েন ক্যাম্পাসে নানা

সমাজকর্মে। উর্দুভাষী হওয়ার সুবাদে একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের মৃত্যুকবল থেকে বাঁচান বহু বাঙালিকে। তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে স্বাধীনতার পর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করলে কর্তৃপক্ষ এই অবাঙালি অধ্যাপককে মধ্যস্থতার জন্য ডাকলে সেটা তখন কাগজের একটা বড় খবর হয়ে ওঠে। এমনই একজন অদ্ভুত মানুষ ছিলেন আশরাফুল হক স্যার। মারা গেলেন কর্মস্থলেই। জানি না অন্তিম সময়ে কারা দেখাশোনা করেছে। যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন বিভিন্ন শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। ভাবি কোথায় ক্রোমোসম নিয়ে গবেষণা আর কোথায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু মেহনতি মানুষ — কীভাবে এই সংযোগ ঘটে? তাঁকে নিয়ে কিছু লেখার কথা কতবার ভেবেছি, কিন্তু হয়ে ওঠে নি, হবে কিনা জানিনা, কেননা আমিও তো বাংলাদেশের গড়-পরমায়ুর সীমানা বহু আগেই পার হয়েছি, আছি বোনাসের আওতায়।

আমাদের ব্রায়োফাইটা পড়াতেন সুলতান আহমেদ খান, তিনিও অবাঙালি, লক্ষ্ণৌবাসী, তবে চেহারাটা ভেতো বাঙালির মতো। বছরের প্রথম ক্লাসে শুরু করতেন একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে, তাতে থাকত বিদ্যাদেবী স্বরস্বতীর সঙ্গে ভারতীয় হেপাটিক্সবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা শিউরাম কাশ্যাপ ও তাঁর শিক্ষক পান্ডেজীর স্তুতিবন্দনা। এমন গুরুভক্ত ছাত্র বস্তুত বিরল। রিক্সিয়া নিয়ে কাজ করতেন, কয়েকটি নতুন প্রজাতিও পেয়ে যান, বলতেন "রিক্সিয়ার কাঠামোগত সারল্য আদিমতার লক্ষণ নয়, 'এভলিউসন বাই রিডাকসন" অর্থাৎ বিবর্তনকৃত লঘুকরণের ফলশ্রুতি। জানি না তাঁর এই ধারণা (হাইপোথেসিস) শেষাবধি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কিনা। আমি ছিলাম তাঁর প্রথম গবেষকছাত্র, হয়ে ওঠেন বন্ধুসম, বলতেন তিনি বৌদ্ধধর্মের দর্শনে আসক্ত, প্রায়ই শোনাতেন সেই তত্ত্বকথা — কাট ইওর ডিজায়ার, ইউ উইল বি হ্যাপি। মার্কসবাদেও হয়ত আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহে তেমন বই দেখেছি, কিন্তু এ নিয়ে কোন কথা হয় নি। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন জনৈক মাহমুদ — মহাত্মা গান্ধীর এককালীন ঘনিষ্ঠ কর্মী, বিখ্যাত চিকিৎসক জহুরা কাজির ভাই, কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিভাগে অধ্যাপনাও করেছেন, 'কুটজ' নামে তাঁর একটি চটি কাব্য ছিল, বিনামূল্যে নিয়মিত বিতরণ করতেন, আমিও পেয়েছি একাধিকবার। সুলতান স্যার ছিলেন ভারতীয় নাগরিক, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর আর ফেরেন নি, লক্ষ্ণৌর শিয়া কলেজের শিক্ষক হন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তাঁকে একটি চিঠি লিখি যার উত্তরের প্রথম পংক্তি ছিল — হাউ ইজ মাই মামুন সাব?

আমি তাঁর তত্ত্বাবধানে "অ্যানথোসেরোটেলিস অব ইস্ট পাকিস্তান" নিয়ে কাজ করি। বেশির ভাগ তাঁরই সংগ্রহ। সেই সময় জিঞ্জিরায় 'ফসোম্ব্রনিয়া'র একটি আগ্রহজনক নমুনা খুঁজে পাই, কিন্তু সময়াভাবে শনাক্ত করা আর সম্ভব হয়নি, তবে থিসিসের পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছিল। কেন জানি আজও নমুনাটির কথা ভুলিনি, তবে স্যার ওভাবে ভারতে

আটকা পড়ে না গেলে আমরা ওটি নিয়ে কাজ করতাম, হয়ত আবিষ্কৃত হত একটি নতুন প্রজাতি বা ভ্যারাইটি। থিসিস পরীক্ষার দিনের কথা মনে পড়ে। সকাল থেকেই স্যার দারুণ উদ্বিগ্ন, আমার চেয়েও অধিক উতলা, যেন পরীক্ষা আমার নয় তাঁর। বিভাগীয় সাধারণ কর্মী মনু মিয়া দুধের গ্লাস নিয়ে এলে সেটা ফিরিয়ে দিলেন, অভুক্ত থাকলেন গোটা দিন, কতবার যে সিঁড়ি বেয়ে অযথা উপর-নিচ করলেন তার গনাগুনতি নেই। আমার জন্য তাঁর এই উৎকণ্ঠার স্মৃতি আজও জীবনের অভিজ্ঞতার পুঁজিতে এক অমূল্যধন হয়ে আছে। ডালটন হুকারের 'হিমালয়ান জার্নাল' নিয়ে লেখা আমার বইটি 'প্লান্ট গ্রুপস্' বইয়ের লেখক, অধ্যাপক এইচ মুখার্জি ও সুলতান স্যারকে উৎসর্গ করেছি। আমার মতো অভাজন ছাত্র আর কীই-বা তাঁদের দিতে পারত!

নূরুল ইসলাম স্যার উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা না গেলে আমি তাঁর অধীনে শৈবালবর্গের কোন গণ নিয়েই স্নাতকোত্তর কোর্সে থিসিস করতাম, কেননা তিনি ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত, ১৯৫৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে উচ্চমাধ্যমিক প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় এক্সটারনল হয়ে যান যখন আমি সেখানে জীববিদ্যার ডেমোনেস্ট্রেটার। কিন্তু সেই নিয়তি আর এড়ান যায়নি, শেষপর্যন্ত ১৯৬৪ সালে নটরডেম কলেজে শিক্ষকতার সময় তাঁর উৎসাহ ও সাহায্যেই 'বাংলাদেশের ক্যারোফাইটা' নিয়ে কাজ শুরু করি। এই সময় তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ ঘটে। তাঁর ভাগ্যে কোন বৃত্তি জুটেনি, অ্যাসিস্টেনশিপ নিয়ে আমেরিকা যান, যার ঝামেলা ও কষ্ট কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। দেশে ফেরেন কেবলই বইপত্র নিয়ে, না গাড়ি, না চমকপ্রদ অন্যকিছু। অর্থবিত্তের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই, চোখে চশমার লেন্সের ওপর লেন্স লাগিয়ে অণুবীক্ষণে নিরন্তর শৈবাল সন্ধান, যেন এই আদিপ্রাণই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। দেখে মনে হত উনিশ শতকী কোন ইংরেজ নিসর্গী ভুলক্রমে এই বিভুঁয়ে আটকা পড়ে আছেন। ছুটির দিন বা দিনগুলো তাঁর ফ্লাটে কাটত, সকাল দুপুর সন্ধ্যার আহার ওখানেই, যেমন গৃহকর্তা তেমনি গৃহিণী, এক আদর্শ গুরুগৃহ, প্রাচীন ভারতের আশ্রমতুল্য। ১৯৭৪ সালে মস্কো না গেলে আমরা বাংলাদেশের ক্যারোফাইটা নিয়ে একটি বই লিখতে পারতাম যা হতে পারত আমার পিএইচডি থিসিস। কিন্তু তা আর হল না। যাওয়ার আগে ক্যারোফাইটা বিষয়ক প্রথম নিবন্ধনটি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টির অধিকাংশ কাজই তখনও বাকি, ভাবিনি কোনদিন শেষ হবে। একদিন স্যারের কাছ থেকে একটি বড় খাম মস্কোয় পৌঁছলে খুলে দেখি ক্যারোফাইটার দ্বিতীয় নিবন্ধটির মুদ্রিত কপি। কৃতজ্ঞতায় অবনত হই। জানি না কত কষ্টই না করছেন এজন্য। মস্কো প্রবাসে আমরা চিঠিপত্র লেখালেখি করেছি, স্যারের কাছ থেকে ৭-৮ পৃষ্ঠার চিঠিও পেয়েছি, এমন শিক্ষকের সংস্পর্শ এক পরম সৌভাগ্য।

গত বছর মস্কো থেকে ফিরে স্যারের সঙ্গে ডিপার্টমেন্টে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন, বললাম অসুস্থ শরীরে এভাবে ক্লাস নেয়া কেন? হেসে জবাব

দিলেন — এভাবে হেঁটে হেঁটেই যে কবরে যেতে চাই। দেখে দুঃখ হলো যে, তাঁর ঘরটি ছোট করে ফেলা হয়েছে স্থানাভাবে। বিদেশে এমনটি অকল্পনীয়। নামী অধ্যাপকরা মারা গেলে অনেকদিন তাদের ঘর তালাবদ্ধ থাকে, কেউ ঢুকতে সাহস পায় না। এমনই সম্মান বয়স্ক শিক্ষকদের। অতিসম্প্রতি প্রফেসর ইসলাম জাতীয় অধ্যাপক হয়েছেন, কিছুটা দেরিতে হলেও প্রাপ্য সম্মান পেয়েছেন এবং সে সঙ্গে এটাও স্বীকার্য তাঁর মতো নিখাদ নির্দলীয় ও নির্বিশেষ নির্বিরোধী শিক্ষকের এমন স্বীকৃতি আজকের পরিস্থিতিতে বড়ই ব্যতিক্রম। তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।*

---

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯৫৪-২০০৪) উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকপত্রের জন্য লিখিত।

আঁখিজল মুছাইলে, জননী

সুফিয়া কামালের লেখা 'একাত্তরের ডায়েরী' (১৯৮৯) প্রকাশিত হওয়ার পরপরই মস্কোয় আমার কাছে পৌঁছায়, সম্ভবত মফিদুল হকের সৌজন্যে। সাদামাটা একটি দিনপঞ্জি — একাত্তরের প্রতিদিনের উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, আশা-নিরাশা, অশ্রু ও আনন্দে ভরা বহু খণ্ডচিত্র, তাতে নানা স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন ছিল এবং বড়ই আশ্চর্যের এই দুঃসময়ে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও স্বপ্নে তাঁকে দেখা দেন। সত্যি আশ্চর্য কি? সুফিয়া কামাল তো বাঙালির সকল মহৎ অর্জনের ধারক, তা থেকে 'যত জীব তত শিব' বাদ পড়বে কীভাবে? বইটি আমাকে আবিষ্ট করে, বারবার পড়ি, পড়তেই হয়, এ যে একাত্তরের গণস্মৃতির অবিস্মরণীয় দলিল, তাতে আছি আমি, আমরা সকলে। বইটির একটি আলোচনা লিখে পাঠাই 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায়, নাম দিয়েছিলাম 'তিনি বাঙালির সাহস' এবং তা এজন্য নয় যে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তা লাগসই, আসলে এটি সুফিয়া কামালের একটি যথার্থ উপমা। ইচ্ছা ছিল তাঁর বাড়ির গাছগাছালি নিয়ে 'সুফিয়া কামালের বাগান' নামে একটি লেখা লিখি। ওই তীর্থে গেছি বহুবার, ঘরে ঢোকার আগেই সারা বাড়ি এক চক্কর ঘুরে এসেছি, কিছুটা অবিন্যস্ত রোপণ সত্ত্বেও আছে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য, প্রাকৃতিক উদ্যানের মতো মুগ্ধকর। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে নি। এখন দুঃখ হয়, তিনি পড়লে খুশি হতেন। স্থান-সুবাদে তিনি আবার আমার আত্মীয়ও, দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছে সিলেটে, তাই আমাকে ডাকার একটা নামও উদ্ভাবন করেন — দ্বিজুবাবু।

তাঁকে প্রথম দেখি ১৯৫৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এক কবি-সংবর্ধনায়। ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা, বজলুর রশিদ এবং লতিফা হিলালী। সভা বসেছিল কলেজের টেনিসলনের পামগাছ ঘেরা সবুজ চত্বরে। কে সভাপতিত্ব করেন মনে নেই, হতে পারে অধ্যক্ষ অবসরপ্রাপ্ত আইসিএস মেকানার্নি। অনুষ্ঠানে স্মৃতিকাতরতায় আকুল সুফিয়া কামাল প্রায় কিছুই বলতে পারেন নি। দুচোখে অঝোর অশ্রু। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পরেও একাধিকবার। বরিশাল গেলেই কলেজে যেতেন। আজকের বৃহত্তর বরিশালে তখন চাখার কলেজ ছাড়া ওই একটিই কলেজ ছিল। আরেকবার তাঁকে দেখি ১৯৫৭ সালে জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউর (বর্তমান বঙ্গবন্ধু অ্যাভিন্যু) ভারতীয় হাই কমিশনের গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানে। প্রধান অতিথি। বক্তৃতা শুনে অবাক হয়েছি। আবেগাপ্লুত দুঃসাহসী ভাষণ। বরিশালের লোকেরা কি এমনই? যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল

হক কলকাতায় এক বক্তৃতা দিয়ে কী কাণ্ডই না বাধালেন! হাইকমিশনের ওই সভায় সুফিয়া কামালকে দেখে অরুণা আসফ আলীর কথা মনে পড়েছিল। সেটা ১৯৫১ সাল, আমি কলকাতার সিটি কলেজের ছাত্র। গেছি গড়ের মাঠের সভায়। উঁচু মঞ্চে দাঁড়ান অরুণা আসফ আলী, খোলা চুল হাওয়ায় উড়ছে, কণ্ঠ থেকে আগুন ঝরছে, নিজেও মূর্তিমান অগ্নিশিখা। এদের দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করান যায়। উভয়ই বরিশালী, চেহারায়ও মিল আছে, মিল আছে জীবনাদর্শেও। ভাবি বরিশাল কি প্রতিভার খনি? কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বাঙালি চরিতাভিধান' পড়ার সুযোগ ঘটে মস্কোয়। অন্তর্ভুক্তিতে বরিশালের সংখ্যাধিক্য নজর কাড়ে, তাই একটা পরিসংখ্যান নেয়ার চেষ্টা করি। যুক্তবঙ্গে খ্যাতিবানদের আঞ্চলিক বিন্যাসের শতাংশ হার অনেকটা এরূপ বরিশাল ৪০, এককভাবে বিক্রমপুর ২০, অবশিষ্ট গোটা বঙ্গ ৪০। সুফিয়া কামাল তখনও বেঁচেছিলেন, এখন হলে বরিশালের পাল্লা আরেকটু ভারি হত। কথাটা মফিদুল হককে শোনালে তিনি ভিন্ন কথা বলেন। এই বরিশালীরা নাকি সকলেই বিক্রমপুরের উদ্বাস্তু। জানি না মফিদুল বিক্রমপুরী কি-না!

মস্কোয় কয়েকবারই আমাদের দেখা হয়েছে। সেইসব স্মৃতি ভোলার নয়। এমন অতিথি এলে তো বাড়িতে মহোৎসব। প্রতি মঙ্গলবার তখন আয়রোফ্লত বিমান ঢাকা থেকে মস্কো যেত। সেদিন খুব ভোরে অধীর আগ্রহে ফোনের ধারে বসে থাকতাম। ফোন বাজা মানে দেশের কারও পৌঁছা-সংবাদ। প্রায়ই বাঞ্ছাপূরণ হতো। কাজকর্ম ফেলে ছুটতাম তাদের খোঁজে এবং সারাদিনের জন্য। একবার দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক বজলুর রহমানের সঙ্গে একনাগাড়ে সপ্তাখানেক কাটাই। এই চলেছিল ১৯৭৪ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত। শেষ অতিথি কে ছিলেন মনে নেই, সম্ভবত পান্না কায়সার, কন্যা শমীর চিকিৎসায়। দিনকাল তখন পালটে যাচ্ছে, তাকে হাসপাতাল থেকে বেরুতে দেয় নি, আমরাও যাওয়ার অনুমতি পাই নি, কথা হয়েছে শুধুই টেলিফোনে।

একবার সুফিয়া কামাল এলেন মস্কোর ভয়ঙ্কর শীতে। গরম জুতা নেই। আমাদের বাড়ি খোঁজাখুঁজি শুরু হল। বাড়তি জুতার অভাব নেই, কিন্তু কোনাটাই তাঁর পায়ে লাগার মতো নয়। আমাদের কন্যার ছোটবেলার একজোড়া জুতায়ই শেষ পর্যন্ত মুশকিল আসান। আমাদের বাড়ি কোনদিন দুপুরে এলে দেখেছি খেয়ে নিয়ে সবার অলক্ষে আমাদের বিছানার এককোণে পা গুটিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। তিনি এলে অবশ্যই হাজির হতেন 'সোভিয়েত নারী' পত্রিকার সম্পাদিকা কামা ইয়াকভলেভা। দু'জনের কন্যা-জননী সম্পর্ক। কামা আমাদেরও খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সমাজতন্ত্রের লুপ্তি ঘটলে প্রগতি প্রকাশনের সঙ্গে 'সোভিয়েত নারী' পত্রিকাও উঠে যায়। আমরা দেশে ফিরি। আমি তখনও বছরে একবার মস্কো যেতাম এবং খবর পেলে প্রতিবারই কামা দেখা করতে আসতেন। আলোচ্য বিষয়ের সিংহভাগ জুড়েই থাকতেন সুফিয়া কামাল। কামাও আর বেঁচে নেই।

মস্কোর সবচেয়ে আনন্দময় স্মৃতির একটি সুফিয়া কামালের 'সাঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থের রুশী-অনুবাদ 'ভেচেরনায়া সুমেরকি' প্রকাশ। এই প্রকল্পে জড়িত ছিলেন কামা, সের্গেই সেরিব্রিয়ানি, মরিয়ম সালদাকিন এবং আরও অনেকে। সের্গেইয়ের সঙ্গে

হায়াৎ মামুদের মাধ্যমেই পরিচয়। তিনি প্রায়ই আসতেন ওর কাছে, বাংলাদেশের কবিতা ও গল্প অনুবাদে সাহায্যের জন্য। হায়াৎ দেশে ফেরার পর আমিই তার বদলি হয়ে ওঠি। রুশ-ভাষায় কবিতা অনুবাদের নিয়ম হলো প্রথমে একাধিক বাংলা-বিশেষজ্ঞ কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ করবেন এবং পরে প্রতিষ্ঠিত একাধিক কবি সেগুলো ছন্দবদ্ধ করবেন। 'সাঝের মায়া' অনুবাদে প্রথম দলে ছিলেন সের্গেইও, আলোচনার জন্য আসতেন প্রায়ই। প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয় সোভিয়েত লেখকসঙ্ঘের প্রাসাদোপম কার্যালয়ে। আমন্ত্রিত হন স্বয়ং কবি। রীতিমতো সমারোহ। পান-ভোজনের এলাহি আয়োজন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম। ননীদা অর্থাৎ ননী ভৌমিকও এসেছিলেন। সুফিয়া কামালের সঙ্গে তাঁদের দু'জনের একটি চমৎকার রঙিন ফটো আমার কাছে অনেকদিন ছিল, এখন আর খুঁজে পাই না।

অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও, আরেকটি ঘটনা বলাও প্রয়োজন। কবি নির্মলেন্দু গুণ আমন্ত্রিত হয়ে একবার মস্কো যান। তিনি তখন কট্টর সাম্যবাদী। লেনিনের জন্মভিটেতেও কিছুদিন কাটান। মস্কো থাকলে রোজ সন্ধ্যায় কালোমেনস্কয়ায় আমাদের কাছে আসতেন। সেই স্মৃতির ফসল 'কালোমেনস্কয়া' নামে একটি কবিতাও তাঁর কাব্যসংগ্রহে আছে। ফেরার সময় নিজের কিছু কবিতার বই আমার কাছে রেখে আসেন। একদিন সের্গেই এলে ওগুলোর কোনটি রুশ-ভাষায় অনুবাদ সম্ভব কিনা তাকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখেন এবং জানতে চান গুণ কী ধরনের কবি। বলি 'বিপ্লবী'। সের্গেই আঁতকে ওঠেন ও তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, 'না, না, আমরা আর বিপ্লব চাই না। তোমার দেশে বিপ্লব মানেই আমাদের খরচা, অর্থাৎ দোকানে আরও লম্বা লাইন।' বইগুলো তিনি আমাকে ফেরৎ দেন, নিজের সংগ্রহে রাখারও আগ্রহ দেখান না। লক্ষণীয় ঘটনাটি আশির দশকের, সমাজতন্ত্রের তখন রমরমা। অবাক হইনি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রাশিয়ায় সর্বাধিক নির্যাতিত হন কবি, কথাশিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। তারা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে মুক্তির পথ দেখতেন। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের পর যে ধাঁচের গণতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে সেই অর্থনীতিতে কিন্তু তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, তাদের এখন বড়ই দুর্দিন। যাদের ছেলেমেয়েরা ব্যবসা বা বিদেশী ফার্মে চাকরি করছে তারাই কেবল ভাল আছেন। এককালের অতিজনপ্রিয় সল্‌জেনিৎসিনের বইয়ের কাটতিও এখন খুব কম। 'দিয়েঙ্গি দ্লিয়া মারি' (মারির জন্য কিছু টাকা) উপন্যাসের স্বনামখ্যাত লেখক ভালেন্তিন রাস্‌পুতিন ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছেন। দ্যুদুনিৎসেভেরও ('নট বাই ব্রেড অ্যালউন' খ্যাত) অভিন্ন অবস্থা। গত বছর কন্যার জন্য মস্কোর বড় বড় বইয়ের দোকানে অনেক খুঁজেও শেষোক্ত দুই লেখকের একটি বইও পাই নি।

একবার চিকিৎসার জন্য সুফিয়া কামাল এলেন মস্কো। তাঁকে রাখা হলো বিখ্যাত সেন্ট্রেল ক্লিনিকাল হাসপাতালে। জায়গাটা শহরের বাইরে বিশাল এক বনের মধ্যে, যেতে হয় পাতালরেলের একটি লাইনের শেষ-স্টেশন মালাদিওশনায়া নেমে আরও অনেক দূর বাসে। কতবার যে কতজনকে দেখতে গেছি, তাতে গোটা এলাকাটা চেনা হয়ে

গিয়েছিল। ওখানেই মারা যান কবি হাসান হাফিজুর রহমান, শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় কমরেড ফরহাদের। সুফিয়া কামালকে সেবার দেখতে যাই সস্ত্রীক। ওখানকার বাঙালি রোগীরা হাসপাতালের অখাদ্য পথ্য গিলে গিলে দেশী খাবারের জন্য হাপিত্যেশ করেন। আমার স্ত্রী একটি কৌটোয় কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতাসহ চেলা-জাতীয় রুশী মাছের ঘন-ঝোল এবং কিছু ভাত সঙ্গে নেন। অবশ্যই ব্যাগে লুকিয়ে। তখন শীতকাল। হাড়কাঁপান ঠাণ্ডা। গোটা শহর ধবধবে সাদা, গাছগুলো প্রায় সবই ন্যাড়া, তবে গায়ে বরফের ঝালর ঝুলিয়ে ভালই সেজেছে ফারগাছ, তাতে ঠিকরাচ্ছে নীলচে আলো। বনকে মনে হয় রূপকথার রাজ্য। অনৈসর্গিক সে সৌন্দর্য।

আমরা তাঁর ঘরে বসে যখন গল্প করছিলাম তখনই খাবার ট্রলি ঠেলে একটি মেয়ে ঢুকল এবং পাশের টেবিলে খাবারগুলো রেখে গেল — সিদ্ধ মুরগির ঠ্যাঙ, কিছু সবজি এবং একটুকরা ছানা। রোগী যেন অনেক চেষ্টায় সামান্য কিছু গলাধঃকরণ করলেন। মেয়েটি ফিরে বাসনকোসন নিয়ে বিদায় হলে আমার গৃহিণী তার কৌটাটি খুললেন। এবার তিনি সবই খেলেন পরম তৃপ্তিতে। অতিপরিচিত এই দৃশ্য। কতবার দেখেছি। কেবল হাসানই ছিল ব্যতিক্রম, কিছুই খেতে পারত না। হাসপাতালের ভাল ভাল খাবারগুলো আমার জন্য রেখে দিত। অগত্যা সুফিয়া কামালকে বললাম — 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার দেশে যান, নইলে রুশী ডাক্তাররা না-খাইয়ে আপনাকে মেরে ফেলবে।' পরদিনই ছাড়া পান, আমাদের বাড়ি এসে ওই মাছরান্না আবার খেতে চান আর বলা বাহুল্য, আমার কোন ভুল হয় নি, দেশে অনেকদিন সুস্থ ছিলেন।

মস্কোয় তাঁর জীবনের কত ঘটনাই না শুনিয়েছেন যেগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী আজও মনে আছে। মহাকবি লেখালেখির মাধ্যমে তাঁকে আগেই জানতেন। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় প্রথম স্বামী নেহাল হোসেন বোরকা পরিয়ে খুব গোপনে তাঁকে নিয়ে যান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, সঙ্গে নেন কবির জন্য একটি কেয়া বা কেতকী ফুল। কবিগুরু দারুণ খুশি। তাঁকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ারও আমন্ত্রণ জানান যা ছিল একেবারেই অসম্ভব। সুফিয়া কামাল জানালেন, তাদের পরিবার অত্যন্ত রক্ষণশীল, এসেছেন লুকিয়ে, স্বামীর আগ্রহে। আমাদের এটুকু শুনিয়েই হঠাৎ থামলেন এবং আমাকে 'সঞ্চয়িতা' আনতে বললেন। আনলাম এবং তিনি 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতার কয়েক পঙক্তি আবৃত্তি করলেন :

'সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে, সখী,
একটি কেতকী।
তখনও হয় নি দ্বীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে।'

রবীন্দ্রনাথ নাকি এই সাক্ষাৎকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই 'পরিচয়' কবিতাটি লেখেন। পরে কয়েকবারই কবির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, তাঁকে সস্নেহে ডাকতেন 'ছোটি বেগম'। ভাবি, রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর মধ্যে মোগল ঘরানার কোন বিদূষী কবি-রাজকন্যাকে খুঁজে পেয়েছিলেন!

বড়-মামা ছিলেন সুফিয়া কামালের আদর্শ চরিত্র এবং আমারও। তাঁকে পর্যবেক্ষণ করা যায় বাংলার একজন টিপিক্যাল সামন্ত হিসেবে। বিস্তারিত আছে লেখিকার 'একালে আমাদের কাল' আত্মজীবনীতে। শায়েস্তাবাদের প্রাসাদোপম বাড়িটি যখন কালাবদরের করাল গ্রাসে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছিল তখন বড়-মামা ওখানেই বসা ছিলেন, মুখে ফরাসি হুকোর নল। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ ছিল গোটা ভারতের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। ঘরে ভরা নানা মূল্যবান সামান। লোকজন ছুটে এল, কিন্তু তিনি তাদের ফিরিয়ে দেন এবং সবকিছুর নিঃশেষ নিমজ্জন নির্বিকার চিত্তে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মধ্যে বাংলাদেশের সামন্তসমাজের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও অর্জনগুলো খুব সহজেই চোখে পড়ে। এখন বুঝি সেগুলো যথাসময়ে যথাযথভাবে জায়মান মধ্যবিত্ত সমাজে আত্তীভূত না-হলে কী বিপর্যয় ঘটে যার ভুক্তভোগী আজ আমরা সকলে। সুফিয়া কামালের পরিবারের ইতিবৃত্ত নেহাৎ গল্পকথা নয়, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক দলিল যা মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। বাংলার ভূমিব্যবস্থায় কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মুসলমানরা নায্য হিস্স্যা পেলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুফিয়া কামালের 'একালে আমাদের কাল' পড়া আবশ্যক মনে করি।

সুফিয়া কামালের জীবন ও কর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, হবে মৌলিক গবেষণাও। সীমিত জ্ঞান নিয়ে অধিক কিছু বলা আমার সাধ্যাতীত। তাঁকে এইটুকু বলেই শ্রদ্ধা জানাতে চাই 'আঁখিজল মুছাইলে, জননী,/অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,/ধন্য তব করুণা।'

কিছুই তো হলো না বলা

> *'But it will be like an old abandoned shell. There is nothing sad about old shells...*
>
> –Antoine de Saint-Exupery.
>
> *'Man must die Chirstopher to reborn'*
>
> –Romain Rolland.

স্বপ্ন যত অসম্ভব ও অবাস্তবই হোক মানুষ অন্তত কিছুকাল তাতেই নিরন্তর তাড়িত হতে থাকে, রেহাই পায় না মুহূর্তকাল। এমন একটি স্বপ্ন ছিল আমার মায়ের। বার্ধক্যে অচল হয়ে পড়েও শোনাতেন সে কথা — যাবেন তরপ পরগনার তুঙ্গেশ্বর, খোয়াই নদীতে শেষ ডুব দেবেন, যে-নদীর সঙ্গে আকৈশোর সখ্য, দাঁড়াবেন জন্মভিটায়, যেসব গাছগাছালি এখনো আছে বারেক দেখবেন সেগুলো, এ টুকুই। অথচ আমরা জানতাম খোয়াই নদী, বা তুঙ্গেশ্বর থাকলেও নেই আর কিছুই। তার স্বপ্ন তাই স্বপ্নই থেকে গেছে। ষাটের দশকে সাঁ-এক্সুপেরির 'দ্য লিট্ল প্রিন্স' পড়ার পর আমিও স্বপ্নাক্রান্ত হয়ে পড়ি, স্থির করে ফেলি, যাব লিবিয়ার মরুভূমিতে যেখানে গ্রহান্তরের ছোট রাজকুমারের উদয় ও অন্তর্ধান ঘটেছিল, তাকাব মরুরাত্রির তারাভরা আকাশের দিকে, খুঁজব রাজকুমারের সেই তারাটিকে আর সেটা না পেলেও জানব ওই তারাগুলোর কোনো একটিতে তিনি আছেন, হাসছেন, মনে হবে যেন-বা সব তারাই হাসছে এবং কেবল আমি, আমিই কেবল সেই হাসিভরা তারাগুলো দেখব, আর কেউ নয়। কিন্তু সময় সবচেয়ে বড় স্মৃতিঘাতী, তাই স্বপ্নটি হারিয়ে গেছে অনেক দিন। কিন্তু ইদানিং আরেকটি স্বপ্নে আমি আচ্ছন্ন, যেতে চাই বিগত আশির দশকের ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ৯-এ সড়কের ৯৪নং বাড়িতে, যেখানে আছে একটি খোলা বারান্দা, এক চিলতে লাগোয়া উঠান, তাতে কিছু অগোছালো গাছগাছালি আর বারান্দায় টেবিলে কুঁজো হয়ে বসে লিখে চলছেন মীজান, প্রিয়সখা, চিরসখা। কিন্তু সেখানে, ভালো জানি, কোনো দিন আর যাওয়া হবে না। মীজান আমাদের ছেড়ে গেছেন ক'দিন আগে, ওই উঠান আর বারান্দায় খাড়া এখন এক সুরম্য বহুতল ভবন। রাজকুমারের উদয় ও অন্তর্ধান স্থলের মতোই দৃশ্যটি স্মৃতিতে থাকবে অনেক দিন নাকি অল্পদিন, ঠিক জানি না, কিন্তু নিশ্চিত জানি যে এটি আমার জীবনের 'আশ্চর্যতম বিষণ্নতম' দৃশ্য।

মীজান গত কয়েক বছরে একাধিকবার ভারত ভ্রমণ করেছেন। ফিরে এসে তার পত্রিকায় মজার মজার কড়চা লিখেছেন, আমাদের নানা গল্পও শুনিয়েছেন। তারই একটি চলেছেন দিল্লি, ট্রেনের লম্বা জার্নি, তাতে বন্ধুত্বে বাধা পড়ে গেলেন এক বৈষ্ণবের সঙ্গে। নিবাস শ্রীধাম মথুরায়, যা অনিবার্য তাই ঘটল। মীজানকে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। মীজান ভাবলেন রেহাই পাবেন খুব সহজেই, নামটি শুনলেই তড়িঘড়ি গুটিয়ে যাবেন বাবাজী। কিন্তু বৃথা। তিনি অধিকতর উল্লসিত, বৈষ্ণবধর্মে জাতপাতের বালাই নেই, তাছাড়া মীজানের মতো এমন প্রকৃত বৈষ্ণবের দেখা পান নি অনেকদিন, অধিকন্তু যখন সঙ্গে আছেন 'বৈদগ্ধা বৈষ্ণবী' নূরজাহান বকসি। মীজান সে যাত্রায় রক্ষা পান বাঙালি বৈষ্ণবীয় বিনয়ে মথুরার বৈষ্ণবকে হারিয়ে, তবে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল বৈষ্ণবীসহ সেখানে পুনঃপ্রব্রজ্যার।

ঘটনাটি শোনার পর যে প্রতীকী সত্যটি আমার কাছে এই প্রথম ধরা দিল তা হল মীজান যথার্থ বৈষ্ণব বলেই আমাদের কুলীনশাসিত বুদ্ধিজীবী সমাজে আজীবন ব্রাত্য হয়েই থেকেছেন, তাদের সমাসনে স্থান পান নি। আমি জানি এ বঙ্গসমাজে মীজানের মতো আরো ক'জন অপাঙ্‌ক্তেয় বৈষ্ণব আছেন যারা পশ্চিমের উন্নত দেশে জন্মালে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হতেন, পিএইচডি ডিগ্রি লাভেচ্ছুদের উপদেষ্টা হতে পারতেন এবং একাধিক লার্নেড সোসাইটির সম্মানসূচক ফেলোশিপও পেতেন। আমাদের কিছু লজ্জাকর সীমাবদ্ধতার হেতু হিসেবে আমরা প্রায়ই ঔপনিবেশিক শাসনের জেরকেই দোষী সাব্যস্ত করি, যা সর্বদা সত্য নয়। এগুলো আসলে বিধ্বস্ত ফিউডাল সমাজের দুষ্ট ও দীর্ঘজীবী জীবাণুর সংক্রমণজনিত রোগ, যা আমরা সচেতনভাবেই বহন করে চলেছি। এ থেকে আরোগ্যলাভ কিন্তু মোটেও সহজ নয়, কেননা ওষুধ আছে কেবল সমাজবিপ্লবের অগ্নিদাহে, যা আজো আমাদের দেশে ঘটে নি, যা ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া সবই রাজনৈতিক ওলটপালট, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার এক ধরনের সহাবস্থানমূলক কিছু জটিল যৌগের আকর।

সমাজকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে দেখলে তার শারীরবৃত্ত আর বিপাকক্রিয়াকেও আমল দিতে হয় এবং এটাও অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যে সমাজে সংঘটিত ঘটনাবলি ও তাতে সম্পৃক্ত লোকদের মধ্য থেকে সমাজ সেসব উপাদানকেই কেবল সংরক্ষণ করে যেগুলো তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিকাশ ও বিবর্তনের সহায়ক, অন্য সব কিছুই পরিত্যাগ করে অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর বর্জ্যের মতো। প্রক্রিয়াটি কিন্তু অতিদীর্ঘ, মহাকালসদৃশ, অনেকটা নদীর ভাঙা-গড়ার মতো। সে কথাই বলেছেন মহাজ্ঞানী আর্থার কোয়েসলার তাঁর 'ডার্কনেস অ্যাট নুন' গ্রন্থে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস মীজানের অবদান আমাদের সমাজশরীরে আত্তীভূত হয়ে তাকে বহুকাল প্রাণশক্তি যোগাবে।

মীজানুর রহমানের মতো লেখকের মৌলিক রচনার সংখ্যা এত কম কেন, এটা আমার কাছে দীর্ঘদিনের একটি দুরূহ ধাঁধা। 'সাহানা' প্রকাশনার লিস্টিতে আছে তার তিনটি বই কমলালয়া কলকাতা, কাকাতুয়া ও কৃষ্ণষোলই। কাকাতুয়া হলো মলিয়েরের লেখা 'হাইব্রাউজ লেডিজ' প্রহসনের অনুবাদ, 'কমলালয়া কলকাতা' বিংশ শতাব্দীর তিরিশ ও

চল্লিশের দশকের মহানগরীর শঙ্খরব আর 'কৃষ্ণঘোলই' ১৯৪৬ সালের কলকাতায় সংগঠিত মহাহত্যাযজ্ঞের চাক্ষুষ বিবরণ। লক্ষণীয়, দুটি মৌলিক গ্রন্থই কলকাতাকেন্দ্রিক স্মৃতিকথা যেখানে তিনি কাটিয়েছেন তার গোটা কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কিছুকাল। স্মৃতিভুবন থেকে সমূল উৎপাটনই কি তা হলে এই বন্ধ্যাত্বের হেতু? নাকি পূর্ব-পাকিস্তান নামের একটি নতুন রাষ্ট্রের বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট সমাজ কাঠামোই এজন্য দায়ী? পরিবেশগত অনভিযোজনার কারণে বন্ধ্যাত্ব ও নষ্ট প্রজাতির দৃষ্টান্ত আছে উদ্ভিদজগতে ভুরি ভুরি। শীতের দেশের বহু বর্ষজীবী ফ্লক্স বাংলাদেশের সমতলে ভালোই বাঁচে, কিন্তু ফুল ফোটায় না একটিও আর নার্সিসাসে ফুল ফোটে মাত্র একবার। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা এ অঘটনের কারণ জানেন ভালোই, কিন্তু 'সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে' তার এ সমস্যার হেতু কি জানেন মনোবিদরা? সম্ভবত না। মীজানের কাছে এ প্রশ্নের সদুত্তর লাভ বৃথা জেনে কোনোদিন জিজ্ঞেস করি নি, কিন্তু ভাবনাটা আমাকে ছেড়ে যায় না কখনই। আমার প্রজন্মের জ্ঞানবুদ্ধির কালিক পরিসর ১৯৪৭-১৯৭৫ পর্যন্ত, তাই প্রশ্নটি তোলা রইল নতুন প্রজন্মের জন্য।

আবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরি। মীজানের কাছ থেকে কী পেয়েছি তার হিসাব-নিকাশ বৃথা। শুধু একটি উদাহরণ দিয়েই লেখাটা শেষ করছি। আমার অগ্রজের 'আত্মজীবনী' মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় বেরোয় কয়েক বছর আগে আর এখন সেটি (শূন্য হাতে ভ্রমী, ডিসেম্বর ২০০৫) বেরিয়েছে গ্রন্থাকারে মীজানের সম্পাদনায় যার অধ্যায় পরিকল্পনা, শিরনাম, উপনাম, উৎসর্গপত্র, গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্রীহট্ট জেলার আঞ্চলিক শব্দের ব্যাখ্যা সবই মীজানের লেখা। একটি ভূমিকাও তিনি লিখেছেন, তাতে আছে আমার অগ্রজ সম্পর্কে একটি পঙ্‌ক্তি 'এমন স্বচ্ছচিত্ত, সুখকর, সুবেত্তা, সুদামা, সুধর্মা এবং সুরসিক সজ্জন ব্যক্তি ভারতে অল্পই জন্ম নেন।' এ মধুক্ষরা শব্দাবলি সহোদর ছাড়া আর কার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হতে পারে?



এক অবিনাশী অনুঘটক

কর্মযোগী যদি যথেষ্ট বইপত্র, নিদেনপক্ষে একটি আত্মজীবনীও না লিখেন তাহলে ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও ভুক্তভোগী আত্মীয়বর্গ ছাড়া অন্যের পক্ষে তাকে নিয়ে তাৎক্ষণিক কিছু লেখা বড়ই কঠিন, সেজন্যে ওই লেখককে গবেষক হতে হয়, কিন্তু লেখকের ভাগ্যে ততটা সময় না জুটলে লেখাটি কতটা পাঠযোগ্য হবে তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। ওয়াহিদুল হক দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন, অজস্র কলাম লিখেছেন যা জানেন শুধু ওই পত্রিকার নিয়মিত পাঠকরা, তাতেও প্রচুর খাদ থাকে, কেননা পত্রিকা-মালিকদের নিজস্ব রাজনীতি বা আদর্শ থাকে, লেখককে তা মান্য করতে হয়। পাকিস্তানপর্বে সৃজনশীল লেখকদের স্বাধীনতা ছিল নামিক, অনেকেই আক্রান্ত হন নিগ্রহাতঙ্কে। বাংলাদেশেও অনেককাল পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নি, গত কয়েক বছর থেকে প্রচারমাধ্যমগুলো অনেকটা স্বাধীনতা পেয়েছে বটে, কিন্তু ততদিনে ওয়াহিদুল হক হয়ে উঠেছেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কট্টর সমর্থক। তাঁর লেখাগুলোর কোনোকোনোটি বস্তুনিষ্ঠ ও চিন্তাঋদ্ধ হলেও বেশিরভাগই ছিল অত্যধিক আক্রমণাত্মক, যা তাঁকে নিয়ে আলোচনার কোনো সহায়ক উপাদান যোগায় না। এজন্যে দোষারোপ নিরর্থক, কেননা বিগত পঞ্চাশ বছর আমরা সামাজিক স্থিতির মুখ দেখেছি খুবই কম, স্বাধীন আত্মবিকাশের সুযোগ আমাদের ভাগ্যে জোটেনি, অনেকে দেশান্তরী হয়েছেন, অনেকে রূপান্তরিত হয়েছেন ভিন্নছাঁদে, তাই ওয়াহিদুল হকও ক্রীড়াঙ্গন, সংগীতসাধনা ও বুদ্ধিচর্চার কোনটিতেই নিবিষ্ট থাকতে পারেন নি, নেমেছেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যা রাজনীতিরই আরেক পিঠ। সুব্যবস্থিত কোনো দেশে জন্মালে, আমি নিশ্চিত, ওয়াহিদুল হতে পারতেন ন্যূনপক্ষে বিশ্বমানের একজন চিন্তক। কখনো কখনো মনে হয় আমরা যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির পরীক্ষাগারে বন্দি নিরীক্ষাধীন এক নৃগোষ্ঠী, যেমনটি বিজ্ঞানীরা পেট্রিডিসে রাখা অণুজীবদের নানা পরিস্থিতিতে ফেলে তাদের পরিণতি পর্যবেক্ষণ করেন।

১৯৪৭ সালে আমাদের যাত্রারম্ভ এক সার্বিক শূন্যতা থেকে। গণদেশান্তরণে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিন্নমতাদর্শী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তখন চরম ভগ্নদশা। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে দেখলাম এককালের বিখ্যাত জগন্নাথ হলে কোনো ছাত্র নেই, সেটা রেজিস্ট্রার্‌স্ অফিস, ঢাকা হলের অর্ধেকটা ফজলুল

হক হলের অ্যানেক্স, বাকি অর্ধেকে আমাদের আবাস, তাও কিছু কক্ষ খালি। উদ্ভিদবিদ্যার স্নাতকোত্তর বিভাগে পাস-অনার্স মিলিয়ে ছাত্রসংখ্যা দশ, কার্জন হল চত্বরে ছাত্রীসংখ্যা আরো কম, আমাদের বিভাগের সিংহভাগ শিক্ষকই অবাঙালি, ভারতীয় উদ্বাস্তু। ঢাকায় তরুণ কবি-সাহিত্যিকের সংখ্যা নগণ্য। সাহিত্যপত্রিকাও নামিক। তাই আমার মতো একজন গেঁয়ো লেখকের পক্ষে দুঁদে আঁতেল হয়ে উঠতে দেরি হয় নি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওয়াহিদুলদের উত্থান ঘটল কীভাবে?

এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। অধঃপতিত জাতির উত্থানের বহু ইতিহাস আমরা জানি। এইসঙ্গে এটিও জানি যে, এসব ঘটনার প্রত্যেকটির স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যও থাকে। সমাজ সজীব সত্তা হলে তার একটি বিপাকক্রিয়াও থাকবে, যা তার আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের অবলম্বন। সমাজের ওপর মানুষ তার ইচ্ছাকৃত কোনো কৃত্রিম কাঠামো চাপাতে চাইলেও সমাজে তা আত্তীভূত হয় না, নইলে যে-মুসলিমলীগ ধর্মীয় ভাবাদর্শভিত্তিক একটি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় সফল হল, মাত্র সাত বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তার নির্বিশেষ বিলুপ্তি ঘটে কীভাবে? আসলে পাকিস্তানি ভাবাদর্শ এতটাই স্থূল ও কৃত্রিম ছিল যে, আমাদের সমাজসত্তা তা গ্রহণ করে নি এবং সেজন্যে সরকারের প্রাণান্ত উদ্যোগ সত্ত্বেও সৃষ্টি হয়নি কোন পাকিস্তানি সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতি। এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের তাগিদে সমাজ আপন অনুঘটক তৈরি করে আর ওয়াহিদুলরা হলেন এই প্রক্রিয়ারই পরিণতি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, সমাজ আপন ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে প্রস্তুত এসব অনুঘটক সংরক্ষণও করে এবং যথাসময়ে কাজে লাগায়। সাতচল্লিশের পর আমাদের এ-ভূখণ্ডে ক্ষুদিরাম সূর্যসেনরা বিস্মৃত হন, কিন্তু ঊনসত্তুর থেকে তাঁদের পুনর্জন্ম ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদবাসীরা রুশ ইতিহাসের অন্যতম নির্যাতক সম্রাট পিটার দ্য গ্রেটের সমাধিতে নতজানু হয়ে নিয়মিত শক্তিপ্রার্থনা করতেন।

বিভ্রান্ত বাঙালিকে সুধন্য বাঙালি বানাতে ওয়াহিদুল অবলম্বন হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে বেছে নিলেন কেন? তিনি একটি লেখায় সন্‌জীদাকে দিশারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি যেভাবে রবীন্দ্র ভাবাদর্শে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তা একান্তই তাঁর নিজস্ব আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই আবিষ্কার করে থাকবেন আপন অভীষ্টলাভে অনুঘটক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সম্ভাব্য-সামর্থ্য। যে-রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গরোধে সশরীরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরই গান যে একদিন হয়ে উঠবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা, ঠাঁই নেবে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের কণ্ঠে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশেরও জাতীয় সংগীত, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে সেটা কি আমরা কেউ কল্পনা করতে পেরেছি!

কিন্তু লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পরও এখানে সামাজিক-রাজনৈতিক সুস্থিতি ফিরল না কেন? এটা কি এজন্যে যে, আমরা দু-দুটো

মৌলিক সামাজিক সংস্থান — ব্রিটিশ আমলের সামন্ততন্ত্র ও পাকিস্তানি পর্বের ধনতন্ত্র এড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং পরবর্তীকালে কোনো পথ বিকল্প না-খুঁজে গতানুগতিক ধারায় এগোতে চেয়েছি? কাজটি ওয়াহিদুল হকের নয়, তবু তাঁর আর বিশ্রাম জোটে না, ক্ষ্যাপা বাউলের মতো দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে চলেন, সঙ্গে সেই রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কথাই আমাদের শোনান, যেন এতেই আছে সর্বরোগহর মহৌষধ।

তত্ত্বকথা অনেক হলো, এবার কিছু 'প্রাণের আলাপ'। ১৯৮৫ সালে মস্কো থেকে ছুটিতে ঢাকায় এলে ওয়াহিদুলের সঙ্গে দেখা করতে যাই। থাকেন কলাবাগানের ওদিকে মায়ের সঙ্গে এক ছোট ফ্লাটে। সম্ভবত আমাদের দ্বিতীয় দীর্ঘ সাক্ষাৎ। বৈঠকখানায় পাটি বিছানো। একপাশে কিছু বাদ্যযন্ত্র, অন্যপাশে বসার ব্যবস্থা। জানালেন তিনি একাহারী নিরামিষাশী, আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। দ্রুত স্নানাহার সারলেন এবং আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নিয়ে গেলেন ধানমন্ডির এক বাড়ির বাগানে, দেখালেন একটি গাছ। মাঝারি উচ্চতা, শাখাপত্রে তেমন নিবিড় নয়, ডালের আগার লম্বা ডাঁটায় নীল ফুলের থোকা, চোখ ফেরান যায় না। জ্যাকারান্ডা। আগে দেখিনি। ওয়াহিদুল শুধু বৃক্ষপ্রেমিক নন, বৃক্ষবিদও। এক দৈনিকে তার একটি লেখা পড়েছিলাম 'অথঃ পুষ্পকথা', তাতে তিনি কিছু জানা গাছপালার বৈজ্ঞানিক শনাক্তি জানতে চান, দেখলাম বিশ বছর উদ্ভিদবিদ্যা পড়িয়ে আমিও নাচার। তাতে পারুল ও মল্লিকা ছিল। প্রথমটির তথ্যাদি সংগ্রহ করা গেলেও দ্বিতীয়টি আজও আমার অচেনাই রয়ে গেছে। আর পারুল নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হল তখনই। বনফুল বিশেষজ্ঞ ড. নওয়াজেশ আহমদ শান্তিনিকেতন ঘুরে জানালেন বঙ্গে পারুল নেই। অধ্যাপক আমিরুল আলম খান আরো দূরে গেলেন এবং শেষে গোটা একটি বই-ই লিখে ফেললেন 'পারুলের খোঁজে'। আর আমি পাথারিয়া পাহাড় থেকে পারুল ভেবে ঢাকায় দুটি গাছ লাগালাম, সাত-আট বছর পর ফুল ফুটিয়ে জানাল তারা পারুল নয়, পারুলের সম্পর্কিত বোন। ওয়াহিদুল হকের কলমের এক খোঁচায় ঘটল এতটা কাণ্ড। এই নিরিখে তাঁর গোটা কর্মকাণ্ডের অভিঘাতের পরিসর কিছুটা হলেও আঁচ করা সম্ভব।

ওয়াহিদুল হকের বৃক্ষবোধও ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা প্রভাবিত। এতে সংশ্লেষিত হয়েছিল বিজ্ঞানের সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব ও দর্শন, এক নতুন সংবেদ আর সেজন্যে লিখতে পেরেছেন 'গাছ আমার পরমাত্মীয়, বিশ্বের সীমাহীন কাণ্ডারে একমাত্র সজীব বন্ধু, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ অবলম্বন। আমার পরমধর্ম — গাছের ভালো আমার ভালো। আমাদের প্রয়োজন একটি বৃক্ষবান্ধব সংস্কৃতিতে জাগরণ। এই নতুন প্রেমধর্মে আমার প্রবর্তনা প্রেরণার মূলে রয়েছে পুষ্পপ্রেম।' শুনেছি ওয়াহিদুল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যা অনুষদে কিছুদিন বহিরাগত অধ্যাপক ছিলেন। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। অনুমান করি ছাত্রছাত্রীর কেউ কেউ হয়তো তাঁর বহুমাত্রিক বীক্ষণে প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

তাঁকে কত কথাই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। আমার আগেই পড়েছিলেন র‍্যাচেল কার্সনের দ্য 'সায়লেন্ট স্প্রিং'। মানবজাতি আজ আপনসৃষ্ট সভ্যতার ফাঁদে যে আটকা পড়েছে, স্বখাত সলিলে যে নিমজ্জমান তা থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় আছে কি? রাশিয়ায় বিশ বছর বসবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার লেখা 'সমাজতন্ত্রে বসবাস' সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধে তাঁর কিছু ইতিবাচক মন্তব্য আমি পড়েছি, এ-নিয়েও সাক্ষাৎ কোনো আলোচনা আর হল না। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে কেন রাশিয়ার হার হল সে-সম্পর্কে তাঁর মতামত জানা আমার বড় প্রয়োজন ছিল। আসলে এমন হঠাৎ করে চলে যাবেন এ ছিল কল্পনাতীত। অনেক রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, খাবারের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন, তাঁর দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এসব কিছুই মান্য করেন নি। জীবনটা বিলিয়ে দিলেন দেশোদ্ধারে, শরীরটাও দিয়ে গেলেন বিজ্ঞানের সেবায়। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিজগতে এমন মানুষ দুর্লভ। কিন্তু আমরা কতদিন তাঁকে মনে রাখব? এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক, কিন্তু জরুরি নয়। সমাজসত্তা তার অনুঘটকগুলো নিজেই সংরক্ষণ করে, সেগুলো সর্বদা দৃশ্যমান না-থাকলেও জাতির দুর্দিনে সেগুলোকে সে উপরিতলে উত্তোলন করে, তাই ওয়াহিদুল সুদিনে না-হলেও ভবিষ্যতের সকল দুর্বিপাকে থাকবেন আমাদের পাশে।

ফরহাদকে মনে পড়ে

১৯৮৭ সালের ৯ অক্টোবর কমরেড ফরহাদ মারা যান মস্কোয়। তখন শরৎকাল। শীতের দেশে পাতা-ঝরার দিন। কথা ছিল তিনি সেদিন আমাদের বাড়ি আসবেন। আমরা যাব বনে রঙের ঝরনা দেখতে। এ সময় ম্যাপল, বার্চ, পপলার ও অ্যাস গাছেরা লাল কমলা হলুদ রঙে সাজে। আসন্ন শীতের মুখে শীতনিদ্রায় যাবার আগে বনের শেষ চমক। বসন্তে গাছগাছালিতে আবার প্রাণ ফেরে, মানুষের এ নিদ্রা আর কোনো দিন ভাঙে না।

ফরহাদ আমার বন্ধু ছিলেন আর সে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বড়ই অদ্ভুতভাবে। ১৯৭৪ সালে মস্কোর 'প্রগতি প্রকাশন' অনুবাদ সংস্থায় যোগ দেয়ার মুখে একদিন এক বন্ধু, যিনি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির ওপরতলার লোক, আমাকে ফরহাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে বলেন। আমি হতবাক। কে এই ফরহাদ যার নামও কোনো দিন শুনি নি? আমি পার্টির সদস্য নই, কিন্তু চিনি অনেককে এবং সর্বদাই ছিলাম পার্টির বহির্বৃত্তে আর সেটা আমার স্বভাবের জন্য, কোনো দলের শৃঙ্খলার মধ্যে ধরা দেয়া, প্রশ্নাতীত আনুগত্যে বন্দি হওয়ার বোধ আমার ধাতে নেই। ওই বন্ধু আমার অপরাধটিও জানিয়ে দেন : আমার কাছে পার্টির অনেক প্রত্যাশা ছিল যা পূরণ করি নি। হাসি পেলেও ভাবনাটি মনে কাঁটার মতো গেঁথে গিয়েছিল।

পরবাসে মানুষ স্মৃতিকাতরতায় ভোগে। মস্কোয় প্রথম প্রথম কিছুই ভালো লাগত না। মঙ্গলবার ঢাকা থেকে এরোফ্লতের বিমান মস্কো পৌঁছাত ভোরে। আমি ফোনের কাছে বসে থাকতাম দেশ থেকে কেউ আসার আশায়। কোনো দিন স্বপ্ন পূরণ হতো, কোনো দিন হতো না। মস্কো গেছেন অথচ আমাদের বাড়ি যান নি এমন বাঙালির সংখ্যা খুব বেশি বলে মনে হয় না। চেনা-অচেনা সবাই তখন পরমাত্মীয়।

একটি ঘটনার কথা আজও মনে পড়ে। কারও খোঁজে আমি ও আমার স্ত্রী গেছি পার্টি-হোটেলে। সেখানেই ওদের সঙ্গে দেখা। আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা, হাঁটছেন লুঙ্গি পরে, গ্রামের মানুষ, সম্ভবত ন্যাপ থেকে মস্কো বেড়াতে এসেছেন। কাছে এসে বললেন, 'ভাই, আপনারা বাঙালি?' পরিচয়পর্ব শেষ হলে জানতে চান, আমরা বাড়িতে ভাত খাই কি না এবং খাই শুনে যেন বড়ই আশ্বস্ত হলেন। 'আমাদের আপনার বাড়ি নেবেন, দুটো ভাত খাওয়াবেন? এখানে ওরা খুব আদর-যত্ন করেন, কিন্তু কিছুই খেতে পারি না।' এমন

অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল। আমার স্ত্রী দোভাষীকে ডাকলেন, যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং যথাসম্ভব আপ্যায়ন। বড় খুশি হয়েছিলেন ওঁরা আর সেই স্মৃতিসুধায় আজও ভরে আছে হৃদয়ের পাত্রখানি।

একদিন খবর পেলাম, ফরহাদ এসেছেন। ফোন করে একবার আমাদের বাড়ি আসার অনুরোধ জানালাম। রাজিও হলেন, কিন্তু আনতে গিয়েই ঝামেলা বাধল। তিনি জানালেন, যেহেতু আমি আমন্ত্রণটি আরেকবার কনফার্ম করি নি, তাই যেতে পারবেন না। এমন কথা কোনোদিন কোনো বাঙালির মুখে শুনি নি। প্রচণ্ড রাগ হলো। শিক্ষকতা ছাড়া কোনো কাজ করি নি, তোয়াজ জিনিসটা ধাতে নেই। অধিকন্তু আমি তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। ভাবছিলাম ফিরে আসব। হঠাৎ করেই মুশকিল আসান হয়ে এলেন কমরেড ফরহাদের স্ত্রী রীনা খান। তাকে চিনি না, আগে কখনো দেখি নি। তিনি বেশ জোরেশোরেই বললেন যে ফরহাদ না গেলেও 'দাদা'র বাড়ি যাবেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে। বাঁচা গেল। ফরহাদ স্ত্রীর সিদ্ধান্ত মান্য করলেন। ফাড়া কাটল। এ নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি। আমি দুই ধরনের কমিউনিস্ট শনাক্ত করেছি। একদল শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শে পার্টিতে আসেন, অন্যরা মানবতাবাদ বাস্তবায়নের স্বপ্নে। প্রথম শ্রেণী কঠিন মনের মানুষ, দ্বিতীয়টি কোমলমনা, তবে প্রকৃতির নিয়মে সংকর বা মিশ্র ধারা থাকাও সম্ভব। জানি না ফরহাদ কোন ধারার কমিউনিস্ট। হতে পারে প্রথম ধারারই ছিলেন, পরে মধ্য বা শেষ দলে ভিড়েছেন আর আমি নিশ্চিত, তাতে অনেকটা অবদান আছে রীনার। সেবার ফরহাদের সঙ্গে তেমন কোনো আলাপ হয় নি, গম্ভীর হয়েই ছিলেন। তার ছোট্ট মেয়ে বয়স ছ'-সাত, রান্নাঘরে আমার স্ত্রীর সাথে ঘুরঘুর করতে করতে একসময় বলে, 'আন্টি, তোমার খুব কষ্ট, আবার আসার সময় তোমার জন্য একজন বুয়া নিয়ে আসব।' শুনে আমরা সবাই হেসে ওঠি। রীনা দ্রুত আমাদের আপনজন হয়ে ওঠেন। তার সঙ্গে এখন আর যোগাযোগ নেই, তবু আছেন আমাদের মনে অনুক্ষণ।

জানতাম না আমার জন্য আরেকটি অভিজ্ঞতা অপেক্ষমাণ ছিল। পরের বার মস্কো এসে সেই প্রত্যাশিত ভোরেই ফরহাদ আমাকে ফোন করেন। তারপর দেখা হলো। তিনি অন্য মানুষ, যেন কত দিনের চেনা, আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বহুকালের। তাহলে কী ঘটেছিল প্রথম বার? রীনাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো কিছু তথ্য মিলত, কিন্তু তা কখনোই মনে আসে নি। আমাদের সম্পর্ক এতটাই জড়িয়ে গিয়েছিল যে, ফরহাদ যখন জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে মস্কোয় পার্টি-হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, একপর্যায়ে রীনা ভেবেছিলেন, ছেলেমেয়ে দুটোকে আমাদের জিম্মায় রেখে ফরহাদের কাছে গিয়ে থাকবেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য অন্তর্দৃষ্টি ফরহাদের ছিল। স্বৈরশাসনের সময় সর্বদলীয় রাজনৈতিক ঐক্যজোট গড়ার কাজে তাঁর মুখ্য ভূমিকার কথা শুনেছি। কমিউনিস্ট পার্টি এ কাজটি করে আসছে ১৯৪৮ সাল থেকে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে পার্টির ভূমিকা সবারই জানা, হয়তো এ দেশে অধিক কিছু করার সম্ভাবনা পার্টির নেইও। ফরহাদের মৃত্যুর পরদিন

তোফায়েল আহমেদ আমাদের বাসায় এসেছিলেন এবং কান্নাজড়িত স্বরে বলেছিলেন, 'ফরহাদভাই চলে গেলেন, পরামর্শ দেয়ার মতো আমাদের কেউ আর রইল না।' ফরহাদ আমাকেও পার্টির সদস্য হতে রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি, কারণ প্রবাসীর পার্টি-সদস্য হওয়ার নিয়ম নেই।

ফরহাদকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভক্তি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের অবলুপ্তি, সমাজতন্ত্রের পতন দেখতে হয় নি। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলে কি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই অভিঘাত সহ্য করে টিকে থাকত? উত্তরটি আমার জানা নেই। ১৯৯৫ সালে স্থায়ীভাবে দেশে ফিরলে পার্টির পুরোনো অনেক বন্ধুর সঙ্গেই দেখা হয়েছে। কেউ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন নি, এমনকি সোভিয়েতবিরোধী সমাজতন্ত্রীরাও না, যেন সকলেই একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা এড়াতে চাইছেন। আমি নিশ্চিত, বেঁচে থাকলে ফরহাদ আমার কাছে আসতেন, আমার কথা শুনতেন।

তাঁকে বলা হয় নি

সন্তোষ গুপ্তর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫৭ সালে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কোর্সে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ি, থাকি ঢাকা হলে। তিনি সেখানে মাঝেমধ্যে আসতেন সম্ভবত ছাত্র-ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের কাছে। আবদুল হালিম ও সমরেশ সুর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছেন, ওদের কারও মাধ্যমে আমাদের এই যোগাযোগ। ইতোমধ্যে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে জীববিদ্যার ডেমনেস্ট্রেটর হিসেবে দুবছর কাজ করেছি, লিখেছিও কিছু, সবই গল্প এবং ছদ্মনামে। স্বনামে লিখিনি কেবল নিজের ওপর আস্থার অভাবে। 'ইত্তেফাক' ছাড়া আর কোথাও লিখেছিলাম কিনা আজ আর মনে নেই। সন্তোষবাবু সেই সময় একটি সাপ্তাহিক সম্পাদনা করতেন, পত্রিকার নামটি ভুলে গেছি, তবে লেখাটি মনে আছে — 'সুরমা ফিরে এসো'। শস্তা রোমান্টিক গল্প। বরিশালে থাকার সময় শহরলাগোয়া গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতাম, পুরনো জমিদার বাড়ি দেখলে সেখানকার ভাঙা পুকুরঘাটে বসতাম। ভাবতাম এখানে কারা থাকত, তারা এখন কোথায় আছে, ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয়ই একদা এই ঘাটে বসত, গল্প করত, গান গাইত, এখন হয়ত আছে পশ্চিমবঙ্গের কোন উদ্বাস্তু কলোনিতে, তাদের দেশে ফেরা দরকার। এসব ভাবনা থেকেই গল্পটির জন্ম। সন্তোষবাবু জানান লেখাটি নাকি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে, বিশেষত সচিবালয়ের কর্মচারিরা বিশেষ কদর করেছেন। ১৯৫৮ সালে আমি বরিশাল ফিরি সেই কলেজেই। তখন আইয়ুব খানের মার্শাল-ল'র জমানা, সন্তোষবাবু তখন নিরুদ্দেশ অথবা জেলে। তারপর আমাদের দেখা হয় নি বহুদিন, সম্ভবত ১৯৭৪ সালে মস্কো যাওয়ার আগেও না। যুবক সন্তোষ গুপ্ত দেখতে কেমন ছিলেন, হাসিখুশি নাকি গুরুগম্ভীর, যেমনটি পরে দেখেছি, তাও মনে নেই।

আমি দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার বহুকালের গ্রাহক। বাংলাদেশ দূতাবাসে *সংবাদ* আসত না। অগত্যা বৃহস্পতিবারের সাহিত্য সাময়িকীর জন্য কেবল ওই দিনের সংখ্যাটি ডাকে নেয়ার ব্যবস্থা করি। যেদিন সেটা পৌঁছত সেদিন মনোজগতে আমি দেশে থাকতাম, স্মৃতিকাতরতার ঘোরে সময় কাটত, গোটা সপ্তাহ ধরেই ওটি পড়তাম, এমনকি বিজ্ঞাপন, কর্মখালি কিছুই বাদ দিতাম না। একটাই আপসোস — অনিরুদ্ধ'র কলামটি সেদিন প্রকাশিত হত না, সন্তোষ গুপ্ত তখন ওই নামে সেটি লিখতেন। অসাধারণ সব লেখা। কঠিন ও জটিল বিষয়বস্তুকে বড়ই সহজ ও আকর্ষণীয় করার কৌশলটি তিনি

জানতেন। সত্য প্রকাশে কখনো কোনো দ্বিধা ছিল না, বই পত্র না-লিখলেও শুধু এজন্যই তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। আমাদের দেশে লেখকের চেয়ে সাংবাদিকদের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ ভেঙ্গে গেলে আমাদের কর্মস্থল মস্কোর 'প্রগতি প্রকাশন' বন্ধ হয়ে যায় এবং আমি ১৯৯৫ সালে দেশে ফিরি। সংবাদ অফিসে আবার যাতায়াত শুরু হয়, দেখা হয় সন্তোষবাবুর সঙ্গে, বসে থাকতেন তাঁর টেবিলে, বড়ই নীরব, কর্মব্যস্ত বা চিন্তামগ্ন। আমার সঙ্গে আলাপ হত খুবই কম, হতে পারে আমি সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যেসব উচ্ছ্বাসিত প্রবন্ধ 'সংবাদ'-এ লিখেছিলাম সেগুলো সম্পর্কে তার মনে গভীর সন্দেহ জন্মেছিল, তিনি গোটা জীবন যে আদর্শের স্বপ্নে প্রাণপাত করেছিলেন সেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। বিষয়টি সন্তোষ গুপ্তর কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল না, ছিল সকল কমিউনিস্টকর্মী ও মতাদর্শীর এবং গোটা বিশ্বের। এই সংকটের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারও কাছে ততটা উপলব্ধ হবার নয়। সোভিয়েত দেশে পার্টির ওপরের স্তরে একাধিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে আর আমার জন্য সবচেয়ে মর্মান্তিক ছিল কবি ও লেখিকা ইউলিয়া দ্রনিনার আত্মহনন। তিনি ছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্টপার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আমার স্ত্রী তাঁর 'এলিসা' বইটি অনুবাদ করেছিলেন। এটি একটি শেয়ালছানার গল্প — কী অসাধারণ রচনা, মনে হয়েছে এক্সুপেরির 'দ্য লিট্‌ল প্রিন্স' গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল, আয়োজনও সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু নিজের গাফিলতির জন্যই হল না, যে-দুঃখ ভোলার নয়।

সন্তোষ গুপ্তর 'সমাজতন্ত্রের অন্য ইতিহাস' (২০০০) এবং আমার লেখা 'সমাজতন্ত্রে বসবাস' (১৯৯৯) ইউপিএল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় একই সময়। বদিউদ্দিন নাজির সন্তোষবাবুর বইটি আলোচনার জন্য আমাকে দেন এবং আমি গভীর মনোযোগসহ সেটি পড়ি। শেষ পর্যন্ত আমি বইটি আর আলোচনা করিনি। কেন করিনি তার কারণ বিবিধ। সমাজতন্ত্রের চিন্তকরা ভ্রান্ত, মার্কস এঙ্গেলস লেনিন ভ্রান্ত, শুধু শুদ্ধ সমাজতন্ত্রের পতনের পরের বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত কমিউনিস্টরাই, এটা আমার কাছে স্বীকার্য মনে হয় নি। আমি তাঁদের তুলনায় কীটস্য কীট, এমন দুঃসাহস পোষণ আমার জন্য প্রকাণ্ড ধৃষ্টতা। তাই বলে, লেখা হবে না এটাও অযৌক্তিক। তবে এখানেও একটি সমস্যা আছে। কমিউনিস্টদের এসব সমালোচনায় কোনই নতুনত্ব নেই। শিক্ষণীয়ও কিছু নেই, অনুশোচনা ছাড়া। কেননা এসব কথা বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ও ভিন্নমতাবলম্বী সমাজতন্ত্রীরা বহু আগেই বলে গেছেন যেগুলো আমাদের কাছে অপপ্রচার হিসেবে পরিত্যক্ত ও নিন্দিত হয়েছে। সন্তোষবাবু আমার বইটি পড়েছিলেন কি না জানি না, তবে তা জিজ্ঞেস করার মতো সাহস আমার ছিল না।

তাঁকে আরেকটি ঘটনার কথাও অজিজ্ঞাসিত থেকে গেল। তাতে অবশ্য কোন দ্বিধার অবকাশ ছিল না, ছিল একই গাফিলতি। আমি কলকাতার সিটি কলেজে পড়ার সময় (১৯৫০-৫২) কিছুদিন ইছাপুর আনন্দমঠ কলোনিতে এক বাসায় ছাত্র পড়িয়ে থাকতাম।

একান্ত গ্রাম্য বলেই হয়ত কলকাতা শহরে অসহায় লাগত, তাই গ্রামীণ পরিবেশে এই আশ্রয়টি আবিষ্কার করি। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সুবাদে সেখানে তখন পাকাবাড়ি উঠছে। একদিন দেখি ভারি ফরসা চেহারার এক প্রৌঢ়া একটি বাড়িনির্মাণ তদারকি করছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপে জানতে পারি ঢাকায় তাদের বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা আত্মগোপনে থাকতেন। একদিন পুলিশ বাড়িটি ঘেরাও করে, ধরা পড়েন অনেকে, সেই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা শ্রেণীর ছাত্র তাঁর ছেলেটিও, যে তখনও জেলে। বলাবাহুল্য তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, এই ধরনের অনেক মা পার্টির জন্য সবর্স্ব দিয়েছেন। বড়ই আকর্ষণীয় তাঁদের সঙ্গ। সন্তোষবাবুও তাঁর বাড়িতে ধরা পড়েন একইভাবে। পরে সেই মায়ের ছেলেটি কলকাতা ফেরে, লম্বা ফর্সা সুদর্শন চেহারা। নিশ্চয়ই সন্তোষবাবু সম্পর্কে সবই জানতেন। এই সুযোগটিও অবহেলায় হারালাম। এখন আর জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ বেঁচে নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ ভেঙ্গে পড়ার পর সমাজতন্ত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে যে পরিব্যাপ্ত ও নিবিড় সংশয় দেখা দিয়েছিল তা এখন সামান্য হলেও কাটতে শুরু করেছে, বিশ্ব আরেকটি বড় পবিবর্তনের মুখোমুখি হতে চলেছে এবং সেটিও সমাজবিকাশের মার্কসীয় সূত্রানুসারে। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির এক পর্যায়ে উৎপাদন সম্পর্কের বদল ঘটে তার কিছু আলামত ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পশ্চিমের কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা আই-টি বিপ্লবের দরুনই আজকের বিশ্বায়নের পাঁয়তারা, কারণ এতে যে পরিমাণ উৎপাদিকা শক্তির উদয় ঘটেছে তাকে দাবিয়ে রাখার আর কোনো বিকল্প পথ বিশ্বপুঁজিবাদ খুঁজে পাচ্ছে না। এটা শুরুমাত্র, তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব আরও এগুবে, আরো শক্তিশালী কমপিউটার উদ্ভাবিত হবে যাদের কাছ থেকে কোনোকিছুই গোপন রাখা যাবে না। গোপনতাহীন একটি ব্যবস্থাপনা কি কল্পনীয়? আমাদের কি তবে স্মৃতি ও হাতে-লেখা খাতার জগতে ফিরতে হবে। তাছাড়াও আছে জ্বালানি বিপ্লব, ফিউসন এনার্জি যা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গবেষণা শুরু করেছিল, তাতে আজ যোগ দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বর্তমান রাশিয়া। এমন দিন খুব বেশি দূর নয় যখন গ্যাস তেল কয়লার বদলে জল হবে মূল জ্বালানি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ দোষণমুক্ত। এই বিপুল শক্তির উৎসরণ বন্ধের ক্ষমতা বিশ্বপুঁজিবাদের নেই, আছে নিয়ন্ত্রণের কূটচাল আর তারা সে-পথেই এগুবে। বর্তমান বিশ্বায়ন তেমনই গোঁজামিলের একটি দৃষ্টান্ত। এই টানাপোড়নে পৃথিবী যদি ধ্বংস না হয়ে যায় তবে অবশ্যই একটি নতুন সভ্যতার জন্ম হবে আর সেটি হবে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন, যে-স্বপ্ন দেখেছেন ধর্মবেত্তাসহ সকল মানবপ্রেমী চিন্তক। সন্তোষ গুপ্ত বেঁচে থাকলে হয়ত এসব ভাবতেন, লিখতেন, আমাদের চলার পথ আলোকিত করতেন।

অন্য কোথা, অন্য কোনখানে

বন্ধু-বান্ধব, এককালের রাজনৈতিক সহকর্মী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখা হলে অনেকেই জানতে চান, রাশিয়ার অবস্থা এখন কেমন। দেশ থেকে আসা চিঠিপত্রেও এই জিজ্ঞাসা থাকে। গত মে মাসে একটি ব্যক্তিগত কাজে মৌলভীবাজার জজকোর্টে গেলে একদল তরুণ আইনজীবী ও জনাকয়েক মক্কেল অত্যন্ত আগ্রহে আমাকে রাশিয়ার কথা জিজ্ঞেস করেন। এদের বেশির ভাগেরই ইচ্ছা আমি যেন তাদের রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা শোনাই। কেউ কেউ লিখতেও বলেন। অতিসম্প্রতি কানাডা থেকে প্রকাশিত 'বাংলা জার্নাল' সাময়িকীর সম্পাদক ইকবাল করিম হাসমুও এমন অনুরোধ জানিয়েছেন। খুবই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। গরিব দেশের শোষিত মানুষ নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি চান এবং রাশিয়াই এতদিন তাদের সেই পথের দিশা দেখিয়েছে, আশান্বিত করে রেখেছে।

শোষণহীন ন্যায়বিচারভিত্তিক একটি সমাজের স্বপ্ন মানুষের বহুকালের, যদিও মানুষ নিজে জীবজগতের অনেক প্রজাতির মতোই হিংস্র ও স্বার্থপর। তার জৈবিক ও সামাজিক বিবর্তন দুটোই ঘটেছে প্রধানত ডারউইন উদ্ভাবিত 'জীবনের জন্য সংগ্রাম' নামের নির্মম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আদিম সাম্যবাদী সমাজেও জাতিগোষ্ঠির মধ্যে সহিংস লড়াই চলেছে এবং হোমোসেপিয়েন্স মানুষেরা ভ্রাতৃপ্রতিম প্রজাতি হোমো নিয়ানডার্থালেনসিস মানুষদের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে, যারা আগুনের ব্যবহার ও পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে জানত, মৃতদেহ কবরে রাখা ও তাতে ফুল দেয়ার সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছিল। জীবজগতে হিংস্রতায় মানুষের সমতুল্য আর একটিমাত্র প্রজাতি আছে, তা এক জাতের পিঁপড়ে, যারা স্বজাতিকে দলবদ্ধভাবে হত্যা ও তাদের সঞ্চয় লুণ্ঠন করে। আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষ কতটা দয়ামায়া ও প্রেম-ভালোবাসা আয়ত্ত করেছিল আমাদের জানা নেই, তবে পরবর্তীকালে ধর্মবেত্তারা নিঃসন্দেহে মানুষকে এসব গুণার্জনে সহায়তা যুগিয়েছিলেন। তারা সাম্যবাদের ধারণাকে মর্ত্যভূমি থেকে স্বর্গে স্থানান্তরিত করে আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন করেছিলেন, কেননা সাম্যবাদ ছিল সেকালের পরিস্থিতিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও সমাজবিবর্তনের জন্য চরম প্রতিকূল ব্যবস্থা, যা টফলার কয়েক হাজার বছর পরের সোভিয়েত সমাজতন্ত্রেও শনাক্ত করেছেন। এসব সত্ত্বেও মানুষ কখনোই সাম্যবাদের

ধারণা পরিত্যাগ করেনি আর বলশেভিকরা সর্বপ্রথম অক্টোবর বিপ্লব ঘটিয়ে রাশিয়ায় সেই ইউটিপিয়া বাস্তবায়নের প্রয়াস পায়, যার তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত করেন মহাজ্ঞানী মার্কস ও প্রয়োগ করেন মহামতি লেনিন।

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ডারউইনের জীববিবর্তনবাদের মতোই একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, যা যতটা অনুমান ততটা প্রমাণনির্ভর নয়, তবু আনুষঙ্গিক অন্যান্য তত্ত্বের তুলনায় সম্পূর্ণতর বিধায় সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির একপর্যায়ে উৎপাদন-সম্পর্কের পুরনো কাঠামো ভেঙে পড়লে সমাজবিপ্লব দেখা দেয় এবং নতুন আরেকটি সমাজব্যবস্থা জন্মলাভ করে। এজন্য মার্কস শিল্পোন্নত জার্মানি বা তদ্রূপ অন্য কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা আঁচ করেছিলেন, রাশিয়ায় মোটেও নয়। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাশিয়ায় কেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটল এ সম্পর্কে লেনিনের ভাষ্য : বিশ্বপুঁজিতন্ত্র অবক্ষয়ের কবলে নড়বড়ে হয়ে উঠলে তার দুর্বলতম আংটা রাশিয়া বিধায় সেখানেই তা প্রথম ভেঙে পড়ে। তারই শৃঙ্খল-বিক্রিয়ায় পরে জার্মানি ও হাঙ্গেরিতে বিপ্লব দেখা দেয় এবং গোটা ইউরোপ এই অভিঘাতে আলোড়িত হতে থাকে। এত্স্কি রুশ বিপ্লবের বিনিময়ে অধিকতর সম্ভাবনাশীল জার্মানির বিপ্লবকে রক্ষার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু দুটিই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে এই আশঙ্কায় লেনিন তাতে রাজি হন নি। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি মাসের বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লবকে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে রূপান্তরের পরিণতি সম্পর্কে লেনিন সম্পূর্ণ নিসংশয় ছিলেন না। তিনি শ্রমিক শ্রেণীকে একটি দুর্লভ সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন, বলা যায়, একটি বৈপ্লবিক পরীক্ষার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, সত্তর বছর পর তাঁর সংশয়ই সত্য ছিল। অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ গোটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ ভেঙে পড়ল এবং সেখানে সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তি ও সদম্ভে পুঁজিতন্ত্রের পুনরুত্থান ঘটল। আসলে কি বিশ্বপুঁজিতন্ত্র বিশশতকের গোড়ার দিকে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল? অনেকেই এখন বলেন, লেনিনের এই ধারণা শুদ্ধ ছিল না। তিনি পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্শক্তির মাত্রা আঁচ করতে পারেন নি। কিন্তু এমনটিও তো হতে পারে যে, জরাগ্রস্ত বিশ্বপুঁজিতন্ত্র অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের অভিঘাতে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, নিজেকে অনেকটা পুনর্গঠিত করে কল্যাণরাষ্ট্রমুখী অভিযাত্রায় সমাজতন্ত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পেরেছিল এবং শেষ পর্যন্ত জয়ীও হল। কিন্তু এখন? সমাজতন্ত্রহীন এককেন্দ্রিক বিশ্বে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী হয়ে ওঠায় বিশ্বপুঁজিতন্ত্রে কি আবারও অবক্ষয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটবে না? ইরাকে আগ্রাসন ও অন্যান্য কিছু ঘটনা কি তেমন আলামতের সাক্ষ্যবহ নয়?

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন এবং সমাজতন্ত্র থেকে চীনের পশ্চাদপসরণ অবশ্যই এমন যুক্তির স্বপক্ষে দাঁড়ায় যে, এসব দেশে সমাজতন্ত্রের অকালপ্রসব ঘটেছিল এবং সেজন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় সমাজতন্ত্র নির্মাতারা তাদের আদর্শের সিংহভাগ বর্জন করে বজ্রকঠোর এক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়েছিলেন, যেজন্য সোভিয়েত দেশে

অন্যূন দু'কোটি পার্টিসদস্য ও সাধারণ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এমন জবরদস্তি অখেরে রাষ্ট্রের জন্য শুভ হয় নি। ১৯৯১ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ার মুখে ইয়েলৎসিনের অনুগত সৈন্যরা পার্লামেন্টে গুলি চালালে জনগণ তাদের রুখতে পথে নামে নি। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে, কেউ ঘরে বসে কেঁদেছে, কেউ-বা আত্মহত্যাও করেছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এখন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পুনরুত্থানের আর কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাই না। রুশ মানুষ জার-আমলের সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব এবং সোভিয়েত আমলের পার্টিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, অবাধ প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের আদিম আকাঙ্ক্ষা তাদের ওপর আছর করেছে, ওদের ফেরানো যাবে না। রাশিয়ায় আজ আমার মতো বৃদ্ধ ও কিছু উগ্রপন্থি যুবক ছাড়া কেউ সমাজতন্ত্র চায় না। পুঁজিতন্ত্র সেখানে দ্রুত শেকড় ছড়াচ্ছে, পাকাপোক্ত ভিত গড়ছে। ইয়েলৎসিন আমলের প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের নগ্ন-নিষ্ঠুর লুটপাটের পরিস্থিতি আজ আর তেমন নেই। প্রেসিডেন্ট পুতিন তা অনেকটা সামাল দিয়েছেন, কিছুটা নিয়ম-শৃঙ্খলাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাশিয়া আর খাদ্যঘাটতির দেশ নয়, সে গম-রপ্তানিকারী ও এক্ষেত্রে ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী। শিল্প-উৎপাদনেও প্রাণসঞ্চার ঘটছে। চেচনিয়া ছাড়া কোথাও বড় ধরনের কোনো অশান্তি নেই। তবে এ সঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, ইয়েলৎসিন আমলের অবাধ গণতন্ত্র এখন কিছুটা সীমিত, রাষ্ট্রের একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতা বর্ধমান। এ নিয়ে দেশে ও বিদেশে সমালোচনা আছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ পুঁজিসঞ্চয়ের মাধ্যমে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একনায়কতন্ত্রের অনেক সাফল্যের দৃষ্টান্ত আমাদের আশপাশেই আছে। তা ছাড়া একনায়কতন্ত্র, অনেকের মতে, রুশ-মানুষের মানসিকতার পক্ষে খুবই লাগসই।

সমাজবিপ্লব ব্যর্থ হলে কী ঘটে তার একটি অসাধারণ ও অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায়। সমাজবিবর্তনে সমাজতন্ত্র যদি যথার্থই পুঁজিতন্ত্রের পরবর্তী পর্যায় হয়ে থাকে তবে ঐতিহাসিক নিয়মে এই পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে একদিন তার পুনরুত্থান ঘটবেই। মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর অবদানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেছিলেন, মার্কসের যে দুটি আবিষ্কার চিরস্থায়ী হবে তা হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও শ্রম-মূল্যের তত্ত্ব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে সমাজকাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবধারিত, তাই পুঁজিতন্ত্র সমাজবিবর্তনের শেষপর্যায় হতে পারে না। যথানিয়মে যথাসময়ে পুঁজিতন্ত্রকে হটিয়ে আরেকটি সমাজব্যবস্থা অবশ্যই জন্মলাভ করবে এবং তা সমাজতন্ত্রই হবে, কেননা অন্যতর সম্ভাব্য কোনো সমাজকাঠামোর কথা আমাদের জানা নেই। সেই সমাজতন্ত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী মোহিত সেন তাঁর 'অ্যা ট্রাভেলার অ্যান্ড দ্যা রোড   দ্য জার্নি অব অ্যান ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এটা সর্বহারার একানায়কতন্ত্রের পরিবর্তে হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন বহু শ্রেণীর রাষ্ট্র।' কার নেতৃত্ব থাকবে সেসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও তা যে বহু শ্রেণীর ও বহু দলের রাষ্ট্র হবে তাতে সন্দেহ নেই।

এককেন্দ্রিক বিশ্বে বিশ্বপুঁজিতন্ত্রের সংকট ও সমস্যার আলোচনা একটি পুরনো প্রসঙ্গ, কিন্তু সাম্প্রতিক উৎপাদিকা শক্তির বিপুল উচ্ছ্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিতন্ত্রের সম্ভাব্য সংকটের আলোচনা ইদানিংকালের বিষয়। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটে গেছে এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবে বিশ্ব আলোড়িত হচ্ছে। ফ. কাপরা তাঁর 'দ্য হিডেন কানেকশন' বইতে বর্তমান বিশ্বায়নকে এই তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের অভিঘাত মোকাবিলায় পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের অনিশ্চিত উদ্ভাবন হিসেবে শনাক্ত করেছেন।

বলাবাহুল্য, তথ্যপ্রযুক্তির অপ্রতিহত বিকাশ অব্যাহত থাকবে, এক দশকের মধ্যে মহাশক্তিধর কোয়ান্টাম কম্পিউটার উদ্ভাবিত হবে, যার কাছ থেকে কোনো দেশ কোনো তথ্য গোপন রাখতে পারবে না। এইসঙ্গে শক্তিউৎপাদন ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটবে, সস্তা হাইড্রোজেন জ্বালানিভিত্তিক দূষণমুক্ত ফিউশন এনার্জি উৎপাদন সম্ভব হবে, নবায়নযোগ্য উপকরণভিত্তিক শক্তি উৎপাদনের নানা কৌশলের আরো উন্নতি ঘটবে। উৎপাদিকা শক্তির এই ক্রমবর্ধমান উচ্ছ্রয় পুঁজিতন্ত্র তার পুরনো কাঠামো ও বণ্টনব্যবস্থা অটুট রেখে কীভাবে মোকাবিলা করে সেটাই হবে দেখার বিষয়। এই সঙ্গে যুক্ত হবে উন্নত দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের মারাত্মক সমস্যাও। এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে নতুন সভ্যতার জন্মলাভের যেমন শুভ সম্ভাবনা আছে, তেমনি রয়েছে বিশ্বধ্বংসের আশঙ্কাও, যা অনেক মনীষী ইতিপূর্বে ব্যক্ত করেছেন, কেননা মানুষ যত দ্রুত তার পরিপার্শ্ব বদলিয়েছে সেই তালে আত্মোন্নতি ঘটাতে পারে নি। তবু আমরা এই আসন্ন সম্ভাবনার ইতিবাচক পরিণতিতে আস্থা রাখতে চাই, স্বপ্ন দেখতে চাই, শ্রেণীসংগ্রাম বা রক্তপাতের বদলে অহিংস পন্থায় একটি সমতাবাদী ন্যায় বিচারভিত্তিক সভ্যতার অভ্যুদয় ও মানুষের যুগযুগান্তের স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখতে চাই। তাই আমাদের চোখ রাখতে হবে রাশিয়া বা চীনের দিকে নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের নব নব সাফল্যের দিকে, এগুলোর সামাজিক অভিঘাতের দিকে এবং এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক দলের দিকে।



সমাজতন্ত্র বিদায় নেয় নি

গত ৬ আগস্ট প্রথম আলোর 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'তে মশিউল আলম লিখিত 'সমাজতন্ত্রে বসবাসের দোলাচল' পড়ে অবাকই হয়েছি, কেননা আমাদের দেশে কোনো বইয়ের ('সমাজতন্ত্রে বসবাস') অযাচিত আলোচনা রীতিমতো দুর্লভ ঘটনা। তাছাড়া বইটি প্রকাশের পর প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত, বিক্রয় সংখ্যাও নগণ্য, শুরুতে বছরে ছিল একশ, এখন ত্রিশ। বইটি কেন বাজার ধরতে পারেনি তার কিছু হেতুর আভাস মশিউল আলমের লেখায় আছে। আমিও তার সঙ্গে একমত। সমাজতন্ত্রের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির কোনটিকেই আমি খুশি করতে পারি নি। মশিউল লিখেছেন, 'লেখক তো জানালেন না এত বছর সমাজতন্ত্রে বসবাস করে ব্যবস্থাটি সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত কী দাঁড়াল।' যথার্থ জিজ্ঞাসা। আমি যে বিভ্রান্ত তেমন সাক্ষ্য বইটিতেই আছে। অধিকন্তু এমন একটি জটিল বিষয় সম্পর্কে কোনো সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো বিদ্যাও আমার নেই। এক্ষেত্রে ক্ষিপ্রসাধারণীকরণের ঝুঁকিও রয়েছে। গোটা বিশ্বের কত মনীষী, কত মহৎ মানুষ এজন্য প্রাণপাত করেছেন তা ভুলি কেমনে? সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর প্রগতি প্রকাশনের সহকর্মীদের কেউ কেউ এ দেশ ছাড়ার সময় তাদের সংগৃহীত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বইগুলো আঁস্তাকুড়ে ফেলে যাচ্ছেন দেখে দুঃখ পেয়েছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ ভেঙে পড়া সত্ত্বেও আমি আজও সমাজতন্ত্রকে সর্বাধিকসংখ্যক মানুষের জন্য সর্বোত্তম রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে মনে করি। তবে ইদানিং এমন একটি ভাবনা আমাকে সর্বদাই আলোড়িত করে এবং তা হল সমাজতন্ত্রের মতো একটি মানবিক ব্যবস্থায় উত্তরণ কি সহিংস শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপুল রক্তপাতের মাধ্যমে সম্ভব? লেনিন মার্কসীয় তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন এবং তার অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান মনে করি, যদিও তাঁর সমগ্র রচনাপাঠ আমার সাধ্যাতীত, যেটুকু পড়েছি তা সামান্য এবং অধিকাংশই অনুবাদ ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের সুবাদে। লেনিনের কোনো কোনো লেখায় এমন ইঙ্গিতও আছে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শান্তিপূর্ণ উপায়েও সম্পন্ন হতে পারে। রুশ-বিপ্লবের পরিণতি দেখে এমন একটি চিন্তা অযৌক্তিক মনে হয় না যে ধনতন্ত্র অপেক্ষা উন্নততর কোনো সভ্যতার জন্য অহিংসাই হবে মূল চালিকাশক্তি, অন্যথা উপায় ও লক্ষ্যের দ্বন্দ্ব নিরসন অসম্ভব হবে এবং বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা বিপ্লবেরই উদরস্থ হবেন।

সমাজতন্ত্র চিরতরে বিদায় নিয়েছে এমন ভাবনার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। সমাজ বিবর্তনের মার্কসীয় ধারণা — উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ একটা পর্যায়ে পৌঁছলে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন অনিবার্য, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি। পুঁজিতন্ত্র এখনো তেমন কোনো ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছায়নি, সে নানা কৌশলে বা অপকৌশলে এই দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করতে সক্ষম, কিন্তু অনন্তকাল তা পারবে না। পুঁজিতন্ত্র মানবসভ্যতার সর্বোত্তম ও শেষ পর্যায় এমন ভাবনা অবশ্যই অযৌক্তিক, বিশেষত আমরা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ তা মর্মে মর্মে অনুভব করি। পশ্চিমের কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন বর্তমান বিশ্বায়ন আসলে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের ফল, অর্থাৎ নতুন উৎপাদিকা শক্তির উচ্ছ্রয়ের অভিঘাতের ফসল। বিশ্ব-পুঁজিতন্ত্র বিশ্বায়নকে কতটা বিশ্বমানবের কল্যাণের উপযোগী করতে পারবে তার ওপর নির্ভর করছে এই ব্যবস্থার সাফল্য। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের তো এটা আরম্ভমাত্র, তার বিকাশ বিশ্ব-পুঁজিতন্ত্রের বিপর্যয় ডেকে আনবে কিনা তা এখনো কেউ জানে না। আরেকটি শক্তি-উৎসের উদ্ভাবনও আসন্ন আর সেটা হলো অ-ফসিল জ্বালানি আবিষ্কার। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স একযোগে ফিউশন এনার্জি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে, তাতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে পানি এবং তাতে কোনো তেজস্ক্রিয় বর্জ্য থাকবে না, শক্তির পরিমাণও হবে বিপুল। এই প্রযুক্তি কি মুষ্টিমেয় পরাশক্তি দীর্ঘকাল তাদের একচেটিয়া দখলে রাখতে পারবে? অবশ্যই না। আমরা তখন বুঝতে পারব পৃথিবীর চেহারাটা কেমন হবে আর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি সত্যিই উৎপাদন সম্পর্ক বদলায় কি না। সেই দিন কিন্তু বেশি দূরে নয়।

মশিউল আলম জানতে চেয়েছেন, 'পৃথিবীতে এত দেশ থাকতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কেন প্রথম রাশিয়াতেই ঘটল, কী করে সত্তর বছর টিকে থাকল আর কেনইবা ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো?' এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত, তবে সবচেয়ে সহজ অনুমান ইউরোপের সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী সামন্ততন্ত্র ছিল রাশিয়ায় আর লেনিনের ভাষায় সেজন্য 'বিশ্বপুঁজিতন্ত্রের দুর্বলতম গ্রন্থি', যথাসময়ে সেখানে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেনি, যখন ঘটল তখন কমিউনিস্টরা তা ছিনিয়ে নেয়ার সুযোগ পেলেন, তারা সমাজ বিকাশের একটি অপরিহার্য পর্যায় পুঁজিতন্ত্র এড়াতে চাইলেন আর সেজন্যই শেষ পর্যন্ত টেকসই সমাজতন্ত্র নির্মাণে সফল হননি। সত্তর বছর রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র টিকে ছিল প্রথমে বিপ্লব থেকে উৎসারিত শক্তি ও জনগণের প্রবল আশাবাদের কল্যাণে, শেষে রাষ্ট্রশক্তির কঠোরতম নিয়ন্ত্রণে। কালে কালে প্রথম দুটি উবে যায়, থাকে শুধু শেষেরটি, সমাজে ব্যাপক দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটে, আমলাতান্ত্রিকতার দরুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সুফল কুড়োতে ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে রাশিয়া ব্যর্থ হয়। টফলারের মতে, 'সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে ওঠে', নতুন প্রজন্মের কমিউনিস্টদের সঙ্গে পুরনোদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, গর্বাচেভ সমাজতন্ত্র সংস্কারের উদ্যোগী হন, কিন্তু ততদিনে পুরো ব্যবস্থাই ক্ষয়ে গিয়েছিল, তাই সংস্কার আর সম্পন্ন হল না, ভেঙে পড়ল গোটা কাঠামো। এভাবেই রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ঘটল, যে-ব্যবস্থাকে এড়াতে চাওয়া হয়েছিল এবং

'অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথ' নামে একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে বিপুল শক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটানো হয়েছিল, আমরা জানি পৃথিবীর কোথাও তা সফল হয়নি। অধিক কিছু বলার মতো জ্ঞানের পুঁজি আমার নেই। তবে এও বলা প্রয়োজন যে, রাশিয়ার ব্যর্থ সমাজতন্ত্র আমাদের জন্য কিছু ইতিবাচক অবদানও রেখে গেছে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দ্রুত পতন, তৃতীয় দুনিয়ার উত্থান (বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনা-পরম্পরাও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য), সমতাভিত্তিক সমাজের জীবনযাত্রার কিছু মূল্যবান দৃষ্টান্ত যা অতীতে কোথাও ছিল না, আজও নেই। মশিউল আলম আপনি ও আপনার মতো অনেকে রাশিয়ায় নিখরচায় লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছেন, এখন দেশে নিজ নিজ পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, আশা করি সমাজতন্ত্রের এ অবদানটুকু অস্বীকার করবেন না। আমি উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক ছিলাম, পড়াতে ও পড়তে ভালোবাসতাম, এসব ছেড়ে অনুবাদকের চাকরি নিয়ে কেন মস্কো গেলাম, মশিউল আলম তা জানতে চেয়েছেন। যৌবনে স্বপ্নে বহুবার সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করেছি, তাই বাস্তব সুযোগ আর হারাতে চাইনি। তা ছাড়া কিছু ব্যক্তিগত কারণও ছিল। সব ছাত্রের মতো আমারও বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উচ্চাশা ছিল, কিন্তু স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় তা আর পূরণ হয় নি। ১৯৭৪ সালে যখন মস্কোয় চাকরি পেলাম তখন জানতাম পড়াশোনা বা গবেষণার কোনোটাই আর হবে না, তবে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশ দেখা যাবে। বোটানিক গার্ডেন, পার্ক ও শৌখিন বাগানের প্রতি আমার আকর্ষণ ছাত্রজীবন থেকে। তা ছাড়া ডারউইন নিয়ে কিছু কাজও করেছিলাম, তাই তাঁর জন্মস্থান শ্রুস্‌বেরি ও কর্মস্থান ডন গ্রামে যাওয়া হবে আমার কাছে প্রব্রজ্যাতুল্য। কিউগার্ডেন, সেন্ট জেমস পার্ক, ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখা ছিল একটি স্বপ্নপূরণ। রাশিয়া যাওয়ার সুবাদে সবই সম্ভব হয়েছে। এই অভিজ্ঞতাগুলো আমার জ্ঞানবুদ্ধি বাড়িয়েছে, বইপত্র লিখতে যথেষ্ট সহায়তা যুগিয়েছে। মশিউল আলম আপনি আমার বইয়ের আলোচনা করেছেন এবং এভাবে আমাকে আরও কিছু কথা বলার সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ।



সামান্য দাবি

ঢাকার এক বহুতল ভবনের দশতলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা আমি। পশ্চিম দিকটা খোলা, কেননা ওদিকের বাড়িগুলো ২-৩ তলা, সামনে বাগান, অনেক গাছগাছালি, তারপর মিন্টো-বেলি রোডের মন্ত্রিপাড়া ঢাকা পড়ে আছে বনস্পতিদের ছায়াতলে, সবশেষে রমনা পার্কের শ্যামলিমা। আমি সকাল-বিকাল পশ্চিমের ঝুলবারান্দায় বসি, দু'চোখ ভরে দেখি ঋতুভেদে নিসর্গশোভার রূপের ডালি, নানা রঙের খেলা। কোনো কোনো অপরাহ্নের সূর্যাস্ত গোটা আকাশের ক্যানভাসে আশ্চর্য সব ছবি আঁকে। কিন্তু সুখ-লক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা। একদিন পাশের বাড়িগুলো ভেঙে ফেলা হলো, কাটা পড়ল বাগানের সব গাছগাছালি, সবুজের শেষচিহ্নটুকুও মুছে গেল। বৃক্ষহননের এ মহোৎসব অসহায়ের মতো দেখতে হলো। বিদেশে অর্থাৎ উন্নত পশ্চিমে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না কখনও। রমনাগ্রিনের অনেকটাই আমার দৃষ্টির আড়ালে লুকালো। ফ্ল্যাটবাড়ি দ্রুত ওঠে। বহুতল একটি ভবনও তৈরি হয়ে গেল প্রায় রাতারাতি। শব্দ, ধুলো, হল্লার জন্য ওই বারান্দায় কদিন যাই নি। একদিন কোনো আওয়াজ না শুনে দরজা খুলি। সামনেই আটতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। একটি ঘরের বারান্দা ঝাট দিচ্ছেন এক মহিলা। ভাবলাম মালিক বা তার স্ত্রী হবেন, নতুন বাড়িতে ওঠার আনন্দে নিজেই কাজে হাত লাগিয়েছেন। কিন্তু ভুলটি ভাঙল অচিরেই। ভেতরের অন্ধকার থেকে ছুটে এলো একটা ন্যাংটো শিশু, বুঝলাম ওই নারী বাড়ির কেউ নয়, কাজের মেয়ে কিংবা নির্মাণ শ্রমিকদলের কর্মী। ইচ্ছা ছিল তার সঙ্গে দুটো কথা বলি, দূরত্বও বেশি নয়, কিন্তু ফারাক অতলগর্ভ, পাড়ি দেয়া সাধ্যাতীত। এই ভুলভাঙা কাঁটার মতো যন্ত্রণাকর হয়ে উঠল। মনে পড়ল সুকান্তের রানার, শামসুর রাহমানের বাতিওয়ালা আর নির্মলেন্দু গুণের ক্ষেতমজুরের বউয়ের কথা। একজনকে কেউ চিঠি লেখে না, অন্যজনের ঘরে বাতি জ্বলে না, শেষজনের বউয়ের একটুকরা নিজস্ব জমির জন্য রোদনভরা আকুতি। ঢাকা শহরে এতসব বাড়িঘর, বহুতল ভবন, সুরম্য প্রাসাদ, আবাসিক কলোনি, কিন্তু নির্মাণকর্মীদের জন্য কিছু নেই, তাদের জন্য এই নগরতরী বড়ই ছোট, এখানে তাদের ঠাঁই হওয়ার নয়।

সত্তর-আশির দশকের মস্কোর কথা মনে পড়ে। নির্মাণশ্রমিকরা সেখানে দিনরাত বাড়ি বানাত। তাদের সকলের জন্যই শহরে ফ্ল্যাট বা বহুতল হোস্টেল ভবন ছিল। ইউরোপের মতো কাউকেই মাসে মাসে মর্টগেজের টাকা গুনতে হতো না। বাড়িঘর, পোশাক-আশাক, পরিবহন দেখে বোঝার জো ছিল না কে শ্রমিক, কে অধ্যাপক, কে ইঞ্জিনিয়ার বা

ডাক্তার। এ মুগ্ধকর অভিজ্ঞতা মস্কোবাসের প্রথম কয়েক দিনের, যা আজও ভুলি নি। ভুলব না কোনোদিন। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে, ঢাউস ঢাউস বই লেখা হয়েছে, আমিও লিখেছি, পুঁজিবাদী বিশ্ব হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, কিন্তু আমরা, গরিব দেশের মানুষরা ওই সমাজের কথা ভুলতে পারছি না, সমতাভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন আমাদের ছাড়তে চায় না কিছুতেই। শহরের গরিব মানুষের আবাসন নিয়ে কত ভাবনাই তো দেশের শাসকবর্গ আমাদের শোনান, কিন্তু একটিও বাস্তবায়িত হয় না। বস্তি গড়ে ওঠে, বস্তিতে আগুন লাগে, সরকার বস্তি উচ্ছেদ করে, আবারও বস্তি গজায়, প্রক্রিয়াটি থামানো যায় না, যাবেও না কোনোদিন। অথচ এই মানুষগুলোই শহরজীবন সচল রাখে, এখন পোশাকশিল্পে শ্রম জুগিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি বৈদেশিক মুদ্রা মালিক ও সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছে, কিন্তু নিজেরা যে-ঘরে থাকে তা গোয়ালের চেয়েও নিকৃষ্ট। সবই আমরা জানি, কিন্তু ভাবি না। আমাদের মন থেকে যেন দয়ামায়া, দায়বোধ অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমি কলকাতার একটি কলেজে পড়তাম। শহরটি আমার ভালো লাগে নি, হয়তো গাঁয়ের মানুষ বলে। থাকতাম ব্যারাকপুরের এক উদ্বাস্তু কলোনিতে ছাত্র পড়িয়ে। তখনও সেসব জায়গায় দালানকোঠা ওঠে নি, সর্বত্র কুঁড়েঘর, কিন্তু আমার কাছে ছিল সবই আনন্দের — গাছগাছালি, পুকুর, বিস্তৃত সবুজ মাঠ। ডেলি-প্যাসাঞ্জেরি করতাম। দূর-দূরান্তর থেকে কর্মজীবীরা ট্রেনে আসতেন, কেউ কেউ কৃষ্ণনগর থেকেও। দিনের বেলায় শহরের লোকসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যেত, সন্ধ্যার পর অর্ধেক। শহরের বাইরে এইসব মানুষ মানবিক পরিবেশে বসবাস করতে পারতেন, এমনকি রিকশাওয়ালা, গৃহসেবিকারাও। এবার দেখলাম উদ্বাস্তু কলোনিগুলো ছোট ছোট শহর হয়ে গেছে, ট্রেনে ভিড় বেড়েছে খুব, তবু সেই পঞ্চাশের দশকের চিত্রটি বদলায়নি।

স্বাধীনতার পর ঢাকা শহরের সম্ভাব্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি আমাদের শাসকবর্গের নজর এড়ানোর কথা নয়। তবে তারা কেন কলকাতার অভিজ্ঞতা নিলেন না? আমরা তো অগ্রাধিকারভিত্তিতে আখাউড়া, ময়মনসিংহ কিংবা আরও দূরে ট্রেন-সুবিধার বিস্তার ঘটাতে পারতাম, মফস্বলের রেলস্টেশনগুলো ঘিরে তখন তৈরি হতো ছোট ছোট শহর, কর্মজীবী মানুষেরা সেখানে ও লাগোয়া গ্রামগঞ্জে অন্তত কিছুটা স্বস্তিতে বসবাস করতে পারতেন। আমি একাত্তরের সংগ্রামের দিনে পূবাইল স্টেশনের কাছে নাগরী গ্রামে কিছুদিন ছিলাম। টিলাটালা ও ঝিলেভরা জায়গাটা ভারি পছন্দ হয়েছিল। এমনটি হলে আজ সিদ্ধেশ্বরীর দশতলায় না থেকে ওখানকার একটি ঘরে মাটির কাছাকাছি গাছগাছালির মাঝখানে অনেক সুখে থাকতে পারতাম। আজ নাগরী পর্যন্ত বাস চলে, কিন্তু এই পরিবহন কখনোই ট্রেনের চাহিদা মেটাতে, রেলগাড়ির বিকল্প হতে পারে না। আজও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ট্রেন সার্ভিস যে মানসম্পন্ন হতে পারল না এ লজ্জা থাকে কোথায়?

আবার নির্মাণ শ্রমিকদের কথায় ফিরি। জানি, সকল কর্মজীবী মানুষের ঠাঁই ঢাকায় হবে না, তবু যে-শ্রমিকরা ঢাকা শহরে বাড়িঘর তৈরি করেছেন ও করছেন তাদের জন্য একটি আধুনিক আবাসন কলোনি গড়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাদের সংখ্যা অগণিত নয়, এটা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যেই আছে। থাকুক না এমন একটি আবাসন শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসার নিদর্শন হয়ে?



জ্যোৎস্না রাতের ঘোড়সওয়ার

"আমার পুরস্কার হচ্ছে আমার জীবনের সেইসব পবিত্র মুহূর্ত যখন লোটার কয়লা-কালো গহ্বর থেকে, শোরার খাদ ও তামার খনি থেকে উঠে এসে — না, বলা উচিত যেন নরকের গর্ত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে — এক একটি লোক, হাড়ভাঙা খাটুনিতে যাদের মুখের চেহারা বিকৃত, ধূলোয় খরখরে লাল চোখ, আমাকে দেখে শুষ্ক প্রান্তরের মতই চৌচির শক্ত হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে ঝকঝকে চোখে উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠে : 'আমি তোমাকে চিনি ভাই!' " — পাবলো নেরুদা

ইতিহাসপ্রেমীর বিরক্তি ঘটানোর ঝুঁকি নিয়েও জননেতা মণি সিংহের ওপর রূপকথাকল্প এই ভাবমূর্তিটি আরোপ করছি, কেন না ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর এমন একটি রূপকল্প আমাদের অনেকের মনেই দৃঢ়বদ্ধ আর সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জননেতারা যে কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে ওঠেন তা তো জানাকথা। টংক আন্দোলনের সময় মণি সিংকে গ্রেপ্তারের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরেই এই জনশ্রুতিটি ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাঁকে দেখা যায় দৈবাৎ জ্যোৎস্নারাতে এক সাদা ঘোড়ার পিঠে, ধরা যায় না। কর্মজীবনে উদ্ভিদসন্ধানে সুসং দুর্গাপুর দেখার পরও এই ভাবমূর্তিটি বিশেষ বদলায় নি। বেগবতী সোমেশ্বরী, প্রবল শালবন আর নীলাচল গারো পাহাড়ের ভূদৃশ্যে সাদা ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ মণি সিংহকে তারাশঙ্করের উপন্যাসের উপজাতি বিদ্রোহের কোন নায়ক হিসেবেই ভেবেছি। আর এখন, তাঁর আত্মজৈবনিক 'জীবন সংগ্রাম' বইটিতে দেখছি ঘোড়াটি সত্যি আছে ('আমাদের পার্টির কাজের জন্য এক বেপারিকে বলে হরিহর ছত্রের মেলা থেকে একটি সুন্দ ঘোড়া আনিয়েছিলাম'), কিন্তু নেই, আমাদের কাঙ্ক্ষিত ঘোড়সওয়ারটি, বদলে আছেন 'পাঁচ হাজার সশস্ত্র লোকের এক মিছিলের পুরোভাগে ঘোড়ার পিঠে আমাদের নেতা ভল্লবী বক্সী।' এখানে তিনি অন্তরালবর্তী এবং সর্বত্রই অন্তরালবর্তী সেইসব ঘটনার আড়ালে, যেগুলো ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হলেও জীবনী লেখকের পরম শত্রু। এই আত্মগোপন এমনই নির্বিশেষ যে তাঁর পিতা-মাতা অবধিও অনুল্লিখিত, নেহাৎই ঘটনাক্রমে জানা যায় দুই ভাইয়ের ('দুই দাদা ছিলেন ভিন্ন চেতনা ও চিন্তার মানুষ। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রশ্নই ছিল না') ও এক বোনের কথা ('এই সময় আমার দিদি নির্মলা সান্ন্যালও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে প্রচারের কাজে

অংশগ্রহণ করেন। নির্মলা সান্ন্যাল ছিলেন মেদিনীপুর কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সভ্য')। এমনকি স্ত্রী অনিমা সিংহও ব্যতিক্রম নন ('অনিমা এই দলে ছিল। তার ছিল অদম্য সাহস। খুবই কষ্টে জীবন যাপন করত। দুইবেলা মাত্র টক দিয়ে ভাত খেত')। তাই এই আত্মগোপনের জন্য ব্যক্তি হিসেবে মণিসিংহের আত্মবিকাশের ধারাটি আমাদের অজানাই থেকে গেল।

কিন্তু নিজেকে আড়াল করার এই চেষ্টা তো ইতিহাসের নিয়মেই ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা ইতিহাসের সজ্ঞান নির্মাণের অন্যতম কারিকাশক্তি হিসেবে ব্যক্তির ভূমিকা মোটেই পরোক্ষ নয়। তাই ব্যক্তি মণি সিংহ এখানে অনুপস্থিত থাকলেও জননেতা মণিসিংহ প্রকটভাবে উপস্থিত এবং জ্যোৎস্নারাতের ঘোড়সওয়ার হিসেবেই।

'জীবন সংগ্রাম' বিধৃত মণিসিংহের প্রবল প্রাণশক্তির পরিচয় পাঠককে আবিষ্ট করে। প্রথমে হাজংদের মধ্যে সংস্কারবাদী আন্দোলন পরিচালনাকালে মস্কো প্রত্যাগত 'নাদুসনুদুস চেহারার' এক যুবকের সঙ্গে প্রবল বিতর্কের পর মার্কসবাদে দীক্ষাগ্রহণ এবং শ্রমিক আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও প্রায় তৎক্ষণাৎ কলকাতায় পৌঁছে কাজ শুরু ও নেতৃত্ব লাভ ('একাত্তর সালে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার দুই দিন পর প্রথম লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক এলাকায় আমাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়'), তারপর দীর্ঘ কারাবাস ও অন্তরীণ থেকে 'মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য' বাড়ি এসে নিজ এলাকার মুসলিম কৃষকদের অনুরোধে ('খোদার রহমতে আপনে খালাস পাইছেন   এহন টংকটা লইয়া লাগুইন, আমরা টংকর জ্বালায় বাচতাছি না') আত্মীয়-স্বজনও নিজ পরিবারের স্বার্থের বিরুদ্ধে টংক আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ('ভাবতে লাগলাম আমি যদি মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাসী হই, যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে থাকি, তবে যেখানে আমার ও আমার পরিবারের স্বার্থ নিহিত রয়েছে, প্রয়োজন ও আদর্শের জন্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা আমার   পরামর্শ করতে পারি এমন কোন বন্ধু তখন ছিল না। আমার মনেও মার্কসবাদী-লেলিনবাদী আদর্শই ছিল আমার বড় বন্ধু')। প্রসঙ্গত স্মরণীয় চীনে বিপ্লবের তখন ভ্রণাবস্থা এবং সমাজবিপ্লবে কৃষকের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসবাদীরাও অনিশ্চিত, সেই অবস্থায় মণি সিংহের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক আন্দোলন ছেড়ে কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ঘটনাটি তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হলেও খুবই কৌতূহলোদ্দীপক বটে।

'জীবন সংগ্রাম' আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু বইটির একটি ভিন্নতর তাৎপর্য রয়েছে। লেখক যে ঈর্ষণীয় স্মৃতিশক্তি ও অপার মমত্বে তাঁর সাথীদের বীরত্ব, ত্যাগ ও আদর্শপ্রীতির বিবরণ দিয়েছেন তাতে বইটি সৃজনশীল লেখকদের জন্য কাঁচামালের একটি সমৃদ্ধ খনি হয়ে উঠেছে   মণি সিংহের পরিচয় লুকানোর জন্য মৌলভীর কাছে অসত্য বলতে অসঙ্কোচ সদ্য-মুরিদ হওয়া কৃষক মাহাতাব উদ্দীন, মৃত্যুশয্যায় তাঁকে যাবতীয় সম্পত্তি দানকারী হাজং পুরোহিত মৃত্যুঞ্জয়

অধিকারী, পুলিশের কাছ থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেয়া রাজবংশী মেয়ে ভাণ্ডানী, ঝাঁটাবাহিনীর দুর্ধর্ষ নেত্রী শূদ্ররমণী সরপানি, পুলিশের ওপর লাঠি চালানায় অভ্যস্ত দীনপুরী, পার্টির কাছে নেশাত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মদ্যপ মঙ্গল সরকারের আজীবন প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যুবরণ, দফাদারের গ্রেপ্তারি থেকে মণি সিংহকে বাঁচানোর জন্য টিকাদারের পর্দানসীন গৃহবধূর অনর্গল বানান গল্প বলা, পার্টির সংবাদবাহক নিরক্ষর চাষী দুঃসাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ গণেশ, পুলিশ ক্যাম্পে চরম নির্যাতনের মুখেও নিশ্চুপ হাজং রমণী অর্শমণি, রাহেলা ও ভদ্র, গুলিতে নিহত ছেলের অবিচলিত পিতা, কৃষক সমিতির কর্মী ও সাবেক লাঠিয়াল হীরালাল বাইন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় প্রতিবেশীদের বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডাদের হাতে নিহত রেলশ্রমিক জহির উদ্দীন । দেশের বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতি ও চরম হতাশার মাঝখানে বাংলার লক্ষ লক্ষ নিহত ও নির্যাতিত মানুষের মতো এইসব মুখও আশাবাদের আলোকবর্তিকা হয়ে আমাদের ভবিষ্যতের পথ দেখাবে।

আগুনের পরশমণি

ভূমিপুত্র, কমরেড জসীমউদ্দিন মণ্ডল, আপনার 'জীবনের রেলগাড়ি' বইটি পড়েছি। লাল সালাম। এমন এক মুহূর্তে বইটি আমার হাতে পৌঁছায় যখন ভারত উপমহাদেশে আবার ছেচল্লিশ সালের মূর্খতার মহামড়ক পুনরাবৃত্ত এবং আকাশে সেই পুরানো শকুনদের বিস্তৃত পাখনার কালোছায়া, আমার জন্য তখন একটু আলো, একটু উত্তাপের বড় প্রয়োজন ছিল। আপনার সংগ্রামী জীবনের রেলগাড়ির আগুন সেই অন্ধকার শীতার্ত দিনগুলোতে আমাকে উষ্ণতা ও আলো যুগিয়েছে, উজ্জীবিত রেখেছে।

কমরেড মণ্ডল, ব্রিটিশ আমলে এক নিবিড় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহে আমারও কৈশোর কেটেছে, তাই আমরা উভয়েই এক অভিন্ন আবেগ, এক সাধারণ স্মৃতির উত্তরাধিকারী। তাই তো আপনার বইয়ের ৩৬-৪০ পৃষ্ঠাগুলো থেকে চোখ তুলতে পারি নি। বার বার পড়েছি ১৯৪৬ সালের কলকাতার মসিলিপ্ত দিনের সেই ঘটনা।

"যেকোন জায়গায় দাঙ্গাকারীরা বেরিকেড করতে পারে এই আশংকা থেকে আউটার সিগনাল পেরোতেই ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন। হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। আমরা দু'জন ফায়ারম্যান অবিরাম বয়লারে কয়লা মেরে চলেছি। ট্রেন যখন নারকেলডঙ্গা ব্রিজের কাছাকাছি এল, দেখলাম লাইনের পাশে অসংখ্য দাঙ্গাবাজ, লাঠিসোঁটা আর বড় বড় তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে। মুখে আকাশ কাঁপানো গর্জন — 'আল্লাহু আকবর'। বুঝলাম মুসলমান দাঙ্গাবাজ। ড্রাইভার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমান গতিতে ট্রেন চালিয়ে গেলেন। দাঙ্গাবাজরা ছিটকে গেল লাইন থেকে অনেক দূরে। তবে বুম্ বুম করে কয়েকটা হাতবোমা পড়ল গাড়ির ওপর। ঝক্‌ঝক্ শব্দ তুলে ট্রেন অবিরাম ছুটে চলেছে। ড্রাইভার, ফায়ারম্যান সবারই একমাত্র সংকল্প যেভাবেই হোক ছিন্নমূল মানুষগুলোকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে হবে। যত বাধা আসুক, যত বিপত্তি আসুক তা অতিক্রম করতে আমরা পিছপা হব না। ব্যারাকপুরের কাছে পলতা স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে আসতেই দেখলাম হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে লাইনের ওপর। সবার হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সূর্যের আলোয় ওদের হাতের অস্ত্রগুলো চক্‌চক্ করছিল। ড্রাইভার নিমিষে বাড়িয়ে দিলেন ট্রেনের গতি। লাইন থেকে সরে দাঁড়াল না দাঙ্গাবাজরা। ওদের সকল অবরোধ ছিন্ন করে ঝড়ের গতিতে ট্রেন ছুটে চলে গেল। লাইন থেকে ছিটকে

পড়ল অনেকে, নৃশংসভাবে কাটা পড়ল ট্রেনের চাকায়।" দাঙ্গাবাজদের জন্য এমন নির্মমতাই অব্যর্থ দাওয়াই, যদিও এখন আপনার মতো জবরদস্ত ধন্বন্তরি চিকিৎসক বড়ই দুর্লভ।

ছেচল্লিশ ও পঞ্চাশের দুটো দাঙ্গার কথাই মনে আছে। আমাদের এলাকায় আমরা তখন যথাক্রমে নোয়াখালির হিন্দু ও ত্রিপুরার মুসলমান উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছি এবং স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এই ধরনের বর্বরতাকে ধিক্কার জানিয়েছে। অতঃপর দ্বিজাতিতত্ত্বসৃষ্ট পাকিস্তান সরকারের প্রকাশ্য ভেদনীতিতে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে চিড় ধরেছে, পঞ্চাশের দেশত্যাগের ঢলের পর ক্রমিক বাস্তুত্যাগ অব্যাহত থেকেছে, জনসংস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটেছে, উভয় সম্প্রদায়ের মানসিকতাও আগেকার স্থিতাবস্থা হারিয়েছে। এতসব সত্ত্বেও তবু একটি সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক তখনও অটুট ছিল। একাত্তরের সংগ্রামের দিনে প্রবাসী বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কর্মী হিসেবে ভারত সীমান্তের বহু আশ্রয়শিবিরে তথ্যসংগ্রাহকের কাজে প্রায় দু'হাজার লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, যাদের অধিকাংশই হিন্দু এবং শুধু একটি পরিবার ছাড়া আর সকলে একবাক্যে সায় দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে 'খুব ভাল' হবে, তারা সকলেই তৎক্ষণাৎ দেশে ফিরবেন। পূর্বোক্ত পরিবারটি কক্সবাজারের জেলে, তারা সমুদ্র থেকে নিজেদের গ্রামটি পুড়তে দেখে ও পরে সপরিবারে সমুদ্রপথে ভারতে পৌঁছায়। তারা আমার সকল প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরতে অনিচ্ছা জানিয়েছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমিও অন্য অনেকের মতই নিশ্চিত ছিলাম যে, বাংলাদেশে আর কোনদিন আমাদের সাম্প্রদায়িক উৎপাতের ঝামেলা পোহাতে হবে না। পঁচাত্তরের পর এই আশাবাদে কিছুটা চিড় ধরলেও প্রায় লাগাতার স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কল্যাণে তা কখনই ফাটল হয়ে ওঠে নি। তাই এবারের (বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর বাংলাদেশে সংঘটিত দাঙ্গা) ঘটনাবলি ছিল একান্তই অভাবিত এবং তা অনুষ্ঠিত এমন একটি নিরীহ জনগোষ্ঠির ওপর যারা পাকিস্তানে বরাবর বৈষম্যের শিকার হয়েছে, অশেষ নির্যাতনভোগ করেছে, দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শর্তহীন সমর্থন দিয়েছে, একাত্তরের সংগ্রামে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও স্বাধীনতার সুফলের প্রায় কোন অংশভাগই পায় নি, এমনকি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বিধ্বস্ত রমনার সুপ্রাচীন কালীবাড়ি ও দুর্গাবাড়ি পুনর্নির্মাণের একান্ত ন্যায্য দাবিটিও জোরেশোরে উচ্চারণ করে নি। ভারতের সংখ্যালঘুরা অবশ্য এই তুলনায় অধিকতর সোচ্চার ও সুসংগঠিত। তবু নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি তারাও আমাদের মতই প্রবঞ্চিত, দুর্বল ও অসহায়। ভাবি, সংখ্যালঘুর ওপর এই অত্যাচারের নিদারুণ লজ্জা ও দুর্ভর আত্মিক দায়ভার এই দু'দেশের সংখ্যাগুরুরা এড়াবেন কীভাবে? প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি মনে পড়ে এবং অশ্রুসিক্ত চোখে বারবার মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করি 'নির্দয়দলিত ওই মানহারা মানবীর কাছে/ক্ষমা ভিক্ষা করো,/হোক তাহা তব সভ্যতার/হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী।'

প্রিয় কমরেড, ভারত উপমহাদেশের অবস্থান্তরের পাশাপাশি আরেকটি মহাবিপর্যয়েরও আমরা সাক্ষী আর একটি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও সেই ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রের পতন। প্রায় দু'দশক মস্কো আছি, চোখের সামনেই তা ঘটল। দীর্ঘকাল বসবাস সত্ত্বেও এদেশের বাস্তবাবস্থা পেরেস্ত্রইকা ও গ্লাসনস্ত শুরুর আগে কখনই সঠিক আঁচ করতে পারি নি, করা সম্ভবও ছিল না। সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে সুদৃঢ় পূর্বপ্রত্যয় এবং মতান্ধতার দরুন ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে কখনই তেমন আমল দিই নি, এগুলোর মূলও খুঁড়ে দেখি নি। অতঃপর সবকিছুই খোলসা হয়ে পড়ে দানবীয় কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের জাড্য, প্রশাসনের রন্ধ্রে রান্ধ্রে প্রবিষ্ট দুর্নীতি, গোটা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ব্যর্থতা। তাই আমরা সমাজতন্ত্রের সংশোধন চেয়েছি, বর্জন নয়। গরবাচেভের মনে কী ছিল জানি না, তবে শেষাবধি লিখাচেভ, আন্দ্রেয়েভাদের আশঙ্কাই সত্য হয়ে উঠেছে। দেশটি এখন এক কর্দমাক্ত জলাভূমিতে আটকে তড়পাচ্ছে এবং উদ্ধারের পথ দেখছে না। আমাদের জন্য এও এক চরম হতাশা। এমন এক নৈরাশ্যময় পরিস্থিতিতে রোমাঁ রলাঁ'র একটি পর্যবেক্ষণ আমাকে খুব ভাবাচ্ছে : 'সাদা হাতের ভণ্ডদের মনোভাবের সামনে নরক থেকে লক্ষ কোটি মানুষকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনার জন্য নিজের জীবন ও কলঙ্ক বা অভিশাপের ঝুঁকি নেয়া লেনিনের মনোভাব আমার কাছে কতবেশি পৌরুষব্যঞ্জক মনে হয়; শুধু পৌরুষব্যঞ্জকই নয়, মানবতার সেবার জন্য বলিদানের আন্তর নীতির সঙ্গে কতবেশি সত্যিকারের প্রেমপূর্ণ, সঙ্গতিপূর্ণও। যদি তিনি ভুল করে থাকেন, তার হৃদয় ভুল করে নি, ভুল করেছে তার চিন্তাবুদ্ধি।'*

রলাঁ সর্বদাই সচেতন প্রাগ্রসর শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ শক্তিকে উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রশমক হিসেবে দেখেছেন। আজ প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন কোন অংশে এবং যুগোশ্লাভিয়ায় যে তাণ্ডব চলছে এবং ভারত উপমহাদেশ ও অন্যত্র যার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়, তা কি এতদিন ঘুণে-ধরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্র অর্থাৎ শ্রমিকের সংঘশক্তি আটকে রাখে নি? এই শক্তি আরও সুবিন্যস্ত হলে হয়ত-বা সত্যিকার একটি নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটাতেও পারত।

সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হল কেন? নমনীয় চিন্তা ও কর্মের অধিকারী লেনিনের অকালমৃত্যু, স্তালিনের মতো এক মতান্ধের ক্ষমতালাভ কিংবা শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের শক্তির সঠিক কার্যকর বিন্যাসের কৌশল উদ্ভাবনে ব্যর্থতার দরুন? অবশ্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত, তবে একই সঙ্গে সমগুরুত্বপূর্ণ হলো সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের মতো একটি অত্যুন্নত সভ্যতার আনুষঙ্গিক একটি বিশ্ববীক্ষার অভাব যেখানে জীবনের বস্তুগত ও আত্মিক চাহিদাগুলো একটি সামঞ্জস্যে সুস্থিত। উৎপাদিকা

রোমাঁ রলাঁ, ভারতবর্ষ দিনপঞ্জী (১৯১৫-১৯৪৩), অনুবাদ অবন্তীকুমার সান্যাল, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা, পৃ. ২৬৫-৬৬।

শক্তির বিকাশ ও পণ্যপ্লাবন শেষাবধি যে একটি কানাগলিতে পৌঁছায় তা তো পুঁজিতন্ত্রের আত্মিক সংকটেই সহজলক্ষ। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনায় যতটা সোচ্চার ছিল, তা থেকে শিক্ষাগ্রহণে ছিল ততটাই অনীহ। তারা যদি সীমিত উৎপাদিকা শক্তি নিয়েই প্রকৃতির সঙ্গে মিথোজীবিতাভিত্তিক, ইকোলজিক্যালি সুস্থিত একটি মধ্য-সচ্ছল সমাজের মডেল দাঁড় করাতে পারত, সেদিকেই তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা চালিত করত, তবে তা আজ পুঁজিতন্ত্রকে কোণঠাসা করে ফেলত, সে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি পরাশক্তি হয়ে উঠত, আর এজন্য কোন সহিংস প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রয়োজন হত না। এক্ষেত্রে স্লাভনিক মনের ধর্মবোধের আনুকূল্যও সম্ভব ছিল।

পুঁজিতন্ত্রই সভ্যতার শেষ ধাপ, সমাজতন্ত্রের পতনেও তা সত্যায়িত হয় না। সভ্যতা এগিয়েই চলবে এবং মানুষ তার অস্তিত্ব ও বিকাশের অনুকূল একটি সুস্থিত সমাজব্যবস্থা নির্মাণের স্বপ্ন কোনদিন ত্যাগ করবে না। মানুষের এই অবিরাম অগ্রগতিতে বিগত যাবতীয় ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা অবশ্যই সাফল্যের সহায়ক হবে। সুতরাং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনজনিত হতাশা অবশ্যই সাময়িক, মেহনতি মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের বাঁচার তাগিদেই নতুন সভ্যতা নির্মাণের লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।

কমরেড জসীমউদ্দিন, জীবনের উপান্তে পৌঁছে তাইতো আপনি লিখতে পারেন 'তবুও হতাশ হতে মন চায় না। এ যেন এক সুকঠিন নেশা, সুতীব্র আকর্ষণ, যা উপেক্ষা করে থাকা কখনও সম্ভব নয়। অনাচার-অত্যাচারের প্রতিবাদে এই বয়সেও ছুটি মিছিলে, ঝাঁপিয়ে পড়ি আন্দোলনে। বক্তৃতার ঝড় তুলি সভামঞ্চে। আর যে-ক'টা দিন বেঁচে আছি, যতদিন অচল অক্ষম না হয়ে পড়ি, ততদিন অক্ষুণ্ন থাকবে আমার জীবনের এই ধারা।' আপনার জীবনের রেলগাড়ির আলো ও উষ্ণতা আমাদের উজ্জীবিত রাখুক।



মম দুঃখের সাধন

তুরীয়ানন্দ অন্বেষী সাধুসন্তরা যেজন্য প্রাণপাত করেন তা সম্ভবত কৈশোরজীবনের মায়াবী সায়রে পুনঃগাহনের সহজসাধ্যতা, কেননা গোটা জীবদ্দশায় আর কখনোই জগৎ আমাদের কাছে এতটা বর্ণময় গন্ধময় স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল থাকে না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরাও বারেক সেই ভুবনের ফেরার আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হই, দৈবাৎ মুহূর্তকালের জন্য ফিরিও-বা এবং তা জপতপ কিংবা নেশাদ্রব্য ছাড়াই, নেহাৎ সাদামাঠা কোন আলম্ব আঁকড়ে, কেননা ওই জীবনে কিছুটা জের তো আমাদের সত্তায় থেকেই যায় কোন না কোনভাবে। এই প্রব্রজ্যায় কখন কখন কোন বই আমার সম্বল হয়ে ওঠে, প্রায় সমাধিস্থ হওয়ার অবস্থায় পৌঁছই, গোটা অভিজ্ঞতাটা সুখ না দুঃখের সেটা নির্ণয় করতে পারি না, কেবলই দোলায়িত হতে থাকি মহাকর্ষহীনতায় উড়ে বেড়ানোর মতো একধরনের অদ্ভুত রোমাঞ্চে। সম্ভবত বিমুগ্ধতার ব্যাপারটাই কোন এক ধরনের অতীতগাহন, আলো-আঁধারিতে, বেলা-অবেলায়, স্মৃতি-বিস্মৃতিতে বিচরণ। এমন একটি সম্মোহিত অভিজ্ঞতার কথা আজও মনে পড়ে। ১৯৫৮ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শেষবর্ষ। পরীক্ষা আসন্ন। নিউমার্কেটে হঠাৎ পেয়ে গেলাম রোমাঁ রোলাঁর *'Soul Enchanted'* গ্রন্থলহরীর প্রথম তিন খণ্ডের বঙ্গানুবাদ 'বিমুগ্ধ আত্মা'। শুরু করেছিলাম দু'তিন পৃষ্ঠার কোটার ভিত্তিতে পরীক্ষার জরুরি প্রস্তুতির অগ্রাধিকার মান্য করে, কিন্তু শেষাবধি তাতে আর অটল থাকা সম্ভব হয় নি। পরীক্ষা শিকেয় তুলে চলে অবিরাম গ্রন্থপাঠ, নিত্যকার সবান্ধব বৈকালিক ভ্রমণ বন্ধ এবং বইটি শেষ হলে রীতিমত আলুথালু অবস্থা। কৈশোরের নিরিখে বর্তমান জীবনের প্রকট মলিনতা ও অতল বিচ্যুতি অবলোকনেই বুঝি-বা এই সুখদ কষ্টভোগ! অভিন্ন অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল দস্তয়েভস্কির 'ইডিয়ট', সাঁ-এক্সুপেরির 'লিট্‌ল প্রিন্স' পাঠেও।

অতিসম্প্রতি মাহমুদুল হক লিখিত 'কালো বরফ' পাঠের কল্যাণে আরেকবার সেই কাঙ্ক্ষিত আস্বাদভোগের অবকাশ ঘটল। মাহমুদুল হক বিরলপ্রজ লেখক। ইতিপূর্বে তার লেখা 'খেলাঘর' পড়ে মনে হয়েছিল এই গ্রন্থপাঠ তীর্থসলিলে পুণ্যস্নানের সামিল। দস্তয়েভস্কির 'ইডিয়ট' উপন্যাসের পর এমন পবিত্র কিছু আর পড়ি নি। 'কালো বরফ' আমাকে আলোড়িত সম্মোহিত করেছে, বারবার কৈশোরের দিনগুলোয় ফিরিয়ে নিয়ে গেছে এবং এবারও যথারীতি সেই হর্ষ আমার ওপর ভর করেছে। স্মৃতির প্রবল তোড়ে মুহূর্তে পৌঁছে গেছি দেশবিভাগপূর্ব যুগে, বলা যায় একটি ভিন্নগ্রহে, যেখানে সবকিছুই

অন্যরকম। সে তো রাম-রহিমদের মিলিত জীবনের টুকরো টুকরো ছবির এক বিস্তৃত মোজাইক, এতে সুখ-দুঃখ, মৈত্রী-দ্বন্দ্ব, প্রেম-অপ্রেম সবই ছিল, তবে সবই আজকের চেয়ে গুণগতভাবে আলাদা, সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তখনই ইনাই চাচার অন্তিম শয্যার ছবি চোখে ভাসে। একটি কুঁড়ের মেঝেতে বিছান চাটাইয়ে শুয়ে আছেন, সম্পূর্ণ বেহুশ, আমাকেও চিনতে পারলেন না। একটি কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। শিয়রে চাচী। বাবার পাঠানো পাঁচটি টাকা দিতেই তিনি কেঁদে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। বুঝতে পেরেছিলেন শেষবারের মতো ভালমন্দ খাওয়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। কিছুক্ষণ আগে বাবা তাঁকে দেখে গিয়েছিলেন এবং ভিষক হিসেবে তাঁর নাড়ীজ্ঞান ছিল আমাদের এলাকায় উপকথাকল্প। আমরা ইনাই চাচার কোলেপিঠেই মানুষ হয়েছি। তাঁর হাত ধরে স্কুলে গেছি, বাজারে ও রথের মেলায় ঘুরেছি। আজও চোখ বুজলেই তাকে দেখতে পাই নাদুস-নুদুস শরীর, থুতনিতে সামান্য দাড়ি, গায়ে ফতোয়া, পরনে লুঙ্গি, হাতে ঢাউস লাঠি। তিনি ছিলেন বাবার সহকারী। ওষুধ তৈরিতে হাত লাগাতেন, বাবার সঙ্গে রোগীবাড়ি ঘুরতেন। একান্ত নিঃস্ব এই ইনাই চাচাকে কোনদিন আমাদের বাড়ি খেতে দেখি নি। মা অনেক সময় তাকে সিধা দিতেন। আমাদের অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান কেউ কারও বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতেন না। তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হত না। ইনাই চাচার মৃত্যুর পরও তার আত্মীয়রা আমাদের আত্মীয়জ্ঞান করেছেন। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ান এমন আত্মীয়তার কত নিবিড় বন্ধনই তো আমি দেখেছি এবং দেশবিভাগের উপপ্লবে সে বন্ধন ছিন্ন হওয়ার করুণ ঘটনা জীবনে কিছু কম ঘটে নি। আমার বাবা ও ইনাই চাচার পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা দু'জনই বিভাগপূর্ব স্বদেশে প্রয়াত হন। অন্যথা তাদের ভাগ্যে কী ঘটত, 'কালো বরফ' গ্রন্থের কুশীলবদের মতো ভুক্তভোগীরা তা ভালই জানেন।

'কালো বরফ' স্মৃতিচারণ কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক প্রচারধর্মী কোন রচনা নয়। এটি আসলে একটি সন্তগাথা, একজন সন্ত ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে যা লেখা অসম্ভব। উদ্বাস্তু মানুষের হিমালয়কল্প উত্তুঙ্গ ও মহাসাগরের মতো অতলগর্ভ যন্ত্রণার যে-ছবি এই গ্রন্থে পরিস্ফুট তা একাধারে বৈশ্বিক ও দেশিক। আমাদের প্রজন্মের অনেকেই কমবেশি এই পরিস্থিতির দর্শক বা ভুক্তভোগী, তবু এপার বাংলার সাহিত্যে, কয়েকটি দাঙ্গাবিরোধী গল্প ছাড়া (হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরও দুটি মৃত্যু', নির্মলেন্দু গুণের 'দেশান্তর', মঞ্জু সরকারের 'প্রতিমা উপাখ্যান' ইত্যাদি) বিষয়টি তেমন প্রাধান্য পায় নি। মাহমুদুল হক পথিকৃৎ না হলেও নিঃসন্দেহে এই ধারার মহত্তম লেখক। আত্মবিস্মৃত বাঙালি এই যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধচিত্ত হতে পারলেই শুধু তার মুক্তির পথটি খুঁজে পাবে, অন্যথা নৈবচ নৈবচ। আমি কোন কোন বইয়ের কিছু কিছু চরিত্রকে আত্মার আত্মীয় জ্ঞান করি, জনারণ্যে তাদের নিয়ত খুঁজে বেড়াই, প্রিয়জনকে তাদেরই আদলে যাচাই করে থাকি, যেমন শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'অন্নদা দিদি', পথের দাবীর 'ভারতী', বিমুগ্ধ আত্মার 'আনেৎ'। এখন থেকে তাদের সঙ্গী হবেন 'কালো বরফ' উপন্যাসের দু'টি চরিত্রও — বাঙালির শত্রুদের ষড়যন্ত্রের বলি মনি ভাই ও স্মৃতিভারবিধ্বস্ত আউটসাইডার অধ্যাপক আব্দুল খালেক।

মোহর আলীর মৃত্যু

আমার জানতে ইচ্ছে হয়, রাবেয়া খাতুনের 'মোহর আলী' উপন্যাসটি পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে কি না। উল্লেখযোগ্য রচনা হওয়া সত্ত্বেও আশঙ্কার সঙ্গত কারণ রয়েছে। কাগজে দেখেছি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের 'কথাসাহিত্যের কথকথা' বইটি তেমন বিক্রি না হওয়ায় অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত নজরুল ইসলামের 'জাসদের রাজনীতি' বইটি নিঃসন্দেহে আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজন। কিন্তু পত্রিকায় বইটির প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন এখনো দেখি। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বইয়ের বাজারে মন্দাভাব স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচনা, আলোড়ন? বলা বাহুল্য, আমাদের মনোজগতেও মন্দাভাব চলছে। যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের ভবিষ্যদের চেহারাটা যতই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে, আমরা আত্মসমালোচনায় ততটাই উৎসাহ হারাচ্ছি।

এখন আমরা তো ইতিহাসের ঘটনাস্রোতে কুটোর মতোই ভাসমান, এই স্রোতশক্তিকে কাজে লাগাতে অক্ষম। এই অসহায় পরিস্থিতিতে কোথাও একটা কূলকিনারা না-পাওয়া অবধি সমালোচনামূলক কিছুই আর আমাদের বড়-একটা আলোড়িত করবে না। হাসান আজিজুল হক তার বইতে আমাদের আত্মতুষ্টির কৃত্রিম খোলসটি ধরে নির্মম টানাটানি করেছেন, নজরুল আমাদের সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন আর রাবেয়া খাতুন আমাদের জন্য প্রায় শতাব্দীকাল আগের বাংলার গাঁয়ের এমন এক ছবি এঁকেছেন যে-সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় আমরা সততই অনাগ্রহী। কখনো কখনো মনে হয়, অতীত সম্পর্কে আমরা উঠপাখির কিংবা কবি শামসুর রাহমানের মেষের নীতি গ্রহণ না করলে আমাদের ভবিষ্যৎ হয়ত আজ এতটা অস্পষ্ট হত না।

'মোহর আলী' পড়ে প্রথমেই মনে পড়েছে আমাদের প্রবীণ সাংবাদিক এবং 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা' উপন্যাসের স্বনামখ্যাত লেখক আবু জাফর শামসুদ্দিনের একটি উক্তি। তিনি কথাটি প্রায়ই বলেন, যার মর্মার্থ অনেকটা এরূপ : 'বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি "কৃষ্ণ চরিত্র" রচনায় যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন ও স্যার সৈয়দ আহমদ ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুসলিম আনুগত্য প্রমাণ করতে যে সময় ব্যয় করেছেন,

তা না করে তাঁরা যদি প্রকৃত আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টির কাজে স্ব-স্ব রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে ব্রতী হতেন তা হলে আজ এই উপমহাদেশের অবস্থা ভিন্নতর হত।' আমাদের পূর্বসূরিদের এই অবিমৃশ্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা তো অতি স্পষ্ট যে, উপমহাদেশের বর্তমান ভূগোলের প্রেক্ষিতেও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী চেতনা সৃষ্টির কাজটা আজও কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে সাহিত্যিকদের ভূমিকা কত তাৎপর্যশীল। তবু আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যিকদের ব্যাপক ও নিবিড় অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য সত্ত্বেও এককভাবে হিন্দু-মুসলিম সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে উল্লেখ্য রচনার সংখ্যা খুবই কম।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'র পর এই ধারায় রাবেয়া খাতুনের 'মোহর আলী' একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এই বৈশিষ্ট্য কেবল বিষয়বস্তুর সামাজিক গুরুত্বের জন্যই নয়, আমাদের ক্ষেত্রে যা দুর্লভ, সেই আধেয় ও আধারের সার্থক সমাবন্ধ-সহ মোহর আলীর মতো একটি টাইপ-চরিত্র নির্মাণের জন্যও। যারা বিভাগপূর্ব গ্রামাঞ্চলে মোটামোটি সাম্প্রদায়িক সমঝোতার পরিবেশে বড় হয়েছেন, যাদের মনে হিন্দু-মুসলিম মিলিত জীবনযাত্রার সেই স্মৃতি আজও অমলিন তারা 'মোহর আলী'র জন্য অশ্রুপাত করবেন। উত্তাল একাত্তরের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও আজ এদেশের দুই সম্প্রদায় যখন পারস্পরিক সমঝোতার অবস্থান উদ্ভাবনে ব্যর্থ, তখন রাবেয়া খাতুন আমাদের সামনে দাঁড় করালেন মোহর আলীকে, অনেকটা মাইলখুঁটির মতো, যেন নিজেদের পতনের দূরত্বটুকু আমরা পরিমাপ করতে পারি। এমন একটি চরিত্র, এমন একটি সংশ্লেষ আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। কিছুটা সীমাবদ্ধ হলেও মোহর আলী তো শ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রত্নমূর্তি, আর্কিটাইপ। মোহর বদ্যি, বদ্যি দাদা, সিদ্ধি সাউয়ের কাকা, নিমাই বাউলের বদ্যি ভাই, কেউ ডাকে কবিরাজ সাব, যিনি ঋক-যজু-সাম বেদ পড়া ত্রিবিদ্যার মানুষ, আয়ুর্বেদ তথা জীবনবেদ হজম করার জন্য তর্করত্নের মতো গোঁড়া ব্রাহ্মণও যাকে সমীহ করেন 'আমাদেরই একজন' বলেন, তিনিই আমাদের মোহর আলী, বিশশতকের গোড়ার দিকের বাংলাদেশের একটি গাঁয়ের নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ, চরম প্রতিকূল পরিবেশে স্বশিক্ষিত, স্বনির্মিত। দাদা ছিলেন দুর্দান্ত লেঠেল, প্রাণ দেন লাঠিধর্ম রক্ষায়। বাবা চিরকেলে গোবেচারা, ঘুমের বিলাসে তৃপ্ত, পুঁথি পড়তেন, গলা ছেড়ে মারফতি মুর্শেদি গাইতেন। পৈতৃকসূত্রে মোহর আলী জমিজমা মন্দ পান নি। ঠিকমত দেখাশোনা করলে ভালই চলত। কিন্তু তিনি ধরলেন অন্য পথ : মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে খাইখালাস শর্তে জমি ছেড়ে দেন। টাকার একটা অংশ যায় কবিরাজি মালমসলা কেনায়। ছেলেদের পড়াশোনার খরচা চালাতে অসুবিধা হয়। স্ত্রী পেয়ারাজান মনে মনে নাখুশ হন। কবিরাজি স্বামীকেই শুধু তার কাছ থেকে সরায় নি, সংসারে অনটনও ঘটায়।

হিন্দুপ্রধান গাঁয়ে হিন্দুদের সঙ্গেই বড় হয়েছেন মোহর আলী। হিন্দুদের গোঁড়ামির জন্য, নিজের সমাজের অনগ্রসরতার জন্য শিক্ষালাভ সহজসাধ্য ছিল না। তবু অসাধ্য সাধন করলেন বাল্যবন্ধু সোমনাথের সাহায্যে, উদারচেতা অন্ধপণ্ডিত ভবস্বামীর আনুকূল্যে। সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ দুইই শেখা হল। কবিরাজ হিসেবে নাম করলেন, কিছুটা

গবেষণাও করেন। কিন্তু দেশে কবিরাজ বিদায়ের রীতি না থাকায় আয়-উপার্জন কিছুই হত না। 'ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এক ধরনের সামাজিক দায়িত্ব পালনের মতো' আর নেশা হিসেবেও 'লতা, বাকল, তুঁতে, পারদ, গন্ধককে মনে হয় অন্য এক জগৎ। এখানকার বাসিন্দা তিনি নিজে, অলৌকিক সঙ্গী তার নিজেরই ধ্যান এই মগ্ন. নিবিড় মুহূর্ত দিয়ে তিনি তৈরি করবেন এমন কিছু যা মানুষের কাজে আসবে শুধু নিরাময় নয়, স্থায়ী আরোগ্য' আনবে।

মোহর আলীর সমাজে আছেন উদারপন্থী হিন্দু জমিদার শংকর দেব, পড়ন্ত মুসলিম জমিদার মল্লিক সাহেবরা, সোমনাথ কবিরাজ ও তার সন্ত্রাসবাদী ছেলে, গোঁড়া ব্রাহ্মণ তর্করত্ন, কূটবুদ্ধি মেঝ-মল্লিক, নিঃস্ব মুসলিম মোহন বাঁশী, পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী হিসাবে লৌহজং বাবুদের রক্ষিতার মেয়ে অপরূপা পুষ্পবতী, সুদখোর টাকা-অন্তপ্রাণ সিদ্ধি সাউ আর এই সঙ্গে ফালুবর্গাদারের মতো অগণিত মানুষ যাদের জোয়ান ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা পড়লে গোরখরচার জন্য ভিক্ষা চাইতে হয় জমিদারবাড়ি, কাঁচা গোরের ওপর কাবুলির লাঠিপেটা দেখে নীরবে অশ্রুপাত ছাড়া যাদের গত্যন্তর থাকে না এবং যতসব খরা, অজন্মা, কলেরা বসন্তে গ্রাম ওলট পালট 'সন্ধ্যা হলেই ক্ষেতের আলে আলে আজান, ঢোল ঝাঝরের নিনাদ, ওলাবিবি আর শীতলার পূজা। গৃহস্থের উঠানের ধূপের ধোঁয়া এক জীবনে বারবার জন্ম নেয় মানুষ, কিন্তু কপাল আর বদলায় না, যেন এক বদ্ধজলা — দিনে দিনে পানি পচে, রং বিবর্ণ হয়, দুর্গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস নেয়ার বাতাস।'

মোহর আলীর নিজের সংসারেও বেশ কটি ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে দারোগা, মেজটি কেরানি। মেয়ে অন্তরা স্বামীগৃহে অনাদৃতা। মৃত ভাই বাবর আলীর দু'টি সন্তান এবং বিধবা স্ত্রী হীরামন। সে রূপসী ও তরুণী বিধায় তার ওপর 'বজ্জাত জিনের নজর', হিস্টিরিয়া রোগী, জ্যোৎস্নারাতে কখনো নিশির ডাকে উঠানে এলোচুলে ঘুরে বেড়ায়, পড়শীদের মজলিশে গান গায় — 'সখা না থাকিলে দেহ ক্যানে থাকে, থাকে ক্যান যৈবন'। ছোট জায়ের জন্য চিন্তিতা পেয়ারাজান স্বামীর কাছে ওষুধ প্রার্থনা করেন. 'তুমি তো ধন্বন্তরী, যমের সঙ্গে পাঞ্জা ধরতে পার, আমাগো ছোট বউয়ের জন্য কিছু করতে পার না?' অন্তরার গন্না-কাটা সন্তান জন্মালে তার মুখেও মোহর আলী অভিন্ন প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি শোনেন, 'আমার খোকার তো এক রতি ঠোটের মাংস নাই খালি, শুনেছি জবাই করা মানুষের কল্লাও জোড়া লাগান যায়।' এমনি তার কাছে কত জনের কত আবদার।

এভাবেই মোহর আলীর জীবন যথারীতি এগিয়ে চলে। ছেলেদের সংসার বড় হয়, আয়-উপার্জন বাড়ে, তারা শহরবাসী হয়, মা-বাবার সঙ্গে ছোটখাটো সংঘাত বাধে, স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ গাঁয়ে পৌঁছায়, অভিন্নহৃদয় সুহৃদ সোমনাথও সেদিকে ঝোঁকেন, নিজে এতে আলোড়িত হন না, তবু সিদ্ধি সাউ সন্ত্রাসবাদীদের হাতে খুন হওয়ার পর গাঁয়ের গরিব মহলে উল্লাস দেখা দিলে এক অন্তর্লীন স্বজ্ঞায় যেন সমাজবাস্তবতার বহুদূর অবধি

দেখতে পেয়ে ভাবেন, 'এক সিদ্ধি সাউ গেছে আরেকজন গজাবে, লেজ-গুটান কাবুলি আবার ফিরে আসবে দ্বিগুণ ধারাল থাবা মেলে।'

কাহিনীর শেষ পর্যায়ে আমরা মোহর আলীকে তার চিরপরিচিত জগতের পক্ষে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে দেখি। পূজার ছুটি উপলক্ষে বাড়িফেরা তার ছেলেরা ঈদুল আযহায় এই প্রথম গরু কোরবানির উদ্যোগ নিতেই গাঁয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মোহর আলী এই বছরের মতো গরু কোরবানি মুলতবি রেখে সমস্যার একটা সাময়িক মীমাংসায় পৌঁছান এবং ছেলেদের প্রবল অসন্তোষ আর মেজ-মল্লিকের উসকানির মুখে সেই সত্যটি উদঘাটন করেন যে এধরনের ঘটনায় দাঙ্গা বাধলে মারা পড়ে সাধারণ মানুষ, লাভ হয় 'সাহা ও নবাবদের'। এরই পরবর্তী পর্যায়ে ওষুধ পরীক্ষায় যখন মোহর আলী মারা যান তখন তার মৃত্যুকে যেন প্রতীকী আত্মহত্যা মনে হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির মধ্যে অতঃপর যে নতুন প্রজন্মের, নতুন বাস্তবতার জন্ম ঘটেছিল সেখানে মোহর আলীর মতো মানুষেরা যে কত বেমানান, কত অসহায় আমরা তা ভালই জানি। তাই বোধহয় মৃত্যুশয্যায় চিরসুহৃদ সোমনাথের এক প্রশ্নের জবাবে যন্ত্রণানীল ঠোঁটে শেষ হাসি ফুটিয়ে মোহর আলী ইশারায় জানিয়েছেন — আর কিছু করার নেই, যেন এই ভাবাদর্শী মানুষের নিয়তি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলিম মিলনে বিশ্বাসী এ দেশের মুসলমানরা দেশবিভাগের পর কী নির্মম লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন তা কারও অজানা নয়। আমাদের সাহিত্যে তারা কখনই পুনর্বাসিত হন নি, এমনকি স্বাধীনতার পরও নয়। এরা তো এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ট্র্যাজিক চরিত্র, তাদের দুঃখ-বেদনার ভার তো হিমালয়তুল্য। এদেরই ঘনিষ্ঠ একজন মানুষের ছবি এঁকেছেন রাবেয়া খাতুন। অতঃপর অন্তত মোহর আলীদের দুঃখের ভার কিছুটা হলেও ঘুচলো।



বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই

উপরোক্ত শিরোনামে হায়াৎ মামুদের লেখা বইটি পেয়েছিলাম বছরকাল আগে, কিছু একটা লেখারও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। লিখেছি, ছিঁড়ে ফেলেছি। অজস্র অসংলগ্ন চিন্তা ভিড় করেছে, আবেগের অপরিমিত উচ্ছ্বয় অপরিহার্য সংযমের বাঁধটি ভেঙে দিয়েছে। জানি, এমনটি ঘটে কখনো কখনো কবিতার ক্ষেত্রে। কৈশোরে 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' কবিতাটি শেষ করতে পারতাম না। অশ্রুতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হত। এখনো 'আফ্রিকা' পড়া কষ্টকর হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো গদ্যরচনা ইতোপূর্বে আমাকে এতটা আলোড়িত করে নি। শুনেছিলাম প্রাগৈতিহাসিক কবরে পাওয়া কয়েক হাজার বছরের পুরনো পদ্মবীজ বিজ্ঞানীদের হাতে অঙ্কুরিত বর্ধিত পুষ্পিত হয়েছে। হায়াৎ মামুদের ওই প্রবন্ধটির জাদুমন্ত্রে আমার শিলীভূত কিছু স্মৃতিও হঠাৎ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, আমার প্রবাসকে অসহ্যতর করে তুলছে আর কিছুতেই ভুলতে দিচ্ছে না লেখকের অনুপম শব্দগুচ্ছে বিধৃত স্মৃতিগন্ধবহ সেই অভিভব 'আমার ব্রাহ্মণীর গৌর ললাটের ভ্রূকুটিতে চকিতে ইরানী উদ্ভাস কাঁপে, আনন্দে আশ্চর্যে হতবাক হই।'

আমি শ্রীভূমির সন্তান। শ্রীভূমি, শ্রীহট্ট, সিলেট। আমি আজও মনে করি বাংলা বিভক্ত না হলে কালক্রমে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে-রূপটি বিকশিত হত তার একটি আদরা চল্লিশের দশকের সিলেটে বিদ্যমান ছিল। ধনেজনে প্রাগ্রসর মুসলিম সমাজের প্রভাবে হিন্দুসমাজ নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল, যেন তখনো অব্যাহত ছিল মোগল সাম্রাজ্যের বিলম্বিত প্রতিভাস। পৈতৃক গ্রন্থসংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত ছিল 'বিষাদসিন্ধু', অগ্রজ নিরন্তর আবৃত্তি করতেন, 'এ কথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর শাজাহান,' মায়ের কণ্ঠে সঙ্গীতের মতো অনুরণিত হত, 'আজকে তোমায় দেখতে এলেম জগৎআলো নূরজাহান।' ভিষগ পিতার রোগীদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিলেন। জিয়াউদ্দীন সাহেব আসতেন ওষুধ নিতে — শুভ্র শ্মশ্রু, গৌর দেহবর্ণ, টিকোল নাক, যেন উঠে এসেছেন নরেন্দ্র দেব অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-ওরমখৈয়াম' কাব্যের পাতা থেকে। ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ে আঁকা তাজমহল আর মোগল বাদশা-বেগমদের ছবি কৈশোরে আমার সৌন্দর্যচিন্তার ধাত্রীতে পরিণত হয়েছিল। পীর, দরবেশ ও দরগার অলৌকিক শক্তিতে বিস্ময় আর আস্থার অন্ত ছিল না।

সহপাঠী খালেকের বাড়ি যেতাম রোজই, রসুইঘর পর্যন্ত আমার অবাধ যাতায়াত। খাবারের আয়োজন হত মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে। আমি কাছেই বসতাম। তখনো হিন্দু-মুসলমানের একত্রে খাওয়া-দাওয়ার রেওয়াজ চালু হয় নি। খালেকের বোন, আমাদের বড় বুবু পরিবেশন করতেন। মাথায় সামান্য আচল, পরনে নীল রঙের চেক-শাড়ি, মায়াভরা অপূর্ব লাবণ্যময় মুখ। কৈশোরে দেখা বুবুর মুখটি আমার স্মৃতিতে বোনের চিরন্তন মুখশ্রীর প্রতীক হয়ে আছে।

বাবার এক রোগিণী, খানদানি গৃহবধূ, দারুণ পর্দানশিন, আসতেন পাল্কিতে। আমাদের মাকে মা, বাবাকে বাবা ডাকতেন। আমরা তাঁকে সুজানগরের বুবু বলতাম। মহিলা-রোগীদের আলাদা বসার ঘর ছিল। তিনি ওখানে বসতেন না। সোজা আসতেন মায়ের কাছে। বোরকা খুলে ফেলে জলচৌকি টেনে নিতেন। মা পান সাজাতেন। এক অদম্য আকর্ষণে আমরা তার কাছছাড়া হতাম না। একবার বুবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। সামনে পুকুর, ইটের পুরনো ফটক, অন্দরমহলে তার কালো-রঙের বিরাট পালঙ্ক ছাড়া আর কিছু মনে নেই। বাবার মৃত্যুর পর অগ্রজ চিকিৎসক হন। বুবুর আসাযাওয়া তখনো চলছে। এতদিনে পালকি ছেড়েছেন। হেঁটেই আসতেন এক মেয়ে-সঙ্গী নিয়ে। একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি বুবু উঠোনে চেয়ারে বসে। বোরকা নেই, চুল খোলা, সপ্তমে গলা চড়িয়ে গান গাইছেন। আশপাশে জনকয়েক দোহার, বুবুর মুরিদবর্গ। তিনি চলেছেন সশিষ্য আজমীর শরীফ। আর ফিরবেন না। মায়ের কাছে শেষবিদায় নিতে এসেছেন। সম্ভবত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। মা কাঁদছিলেন। পরেও কতবার মায়ের কাছে বুবুর কথা শুনেছি। কোনোদিন ভুলতে পারেন নি তাঁর দুঃখিনী মেয়েটিকে।

ছেলেবেলায় আমাকে 'আলীর বাবা' বলে ক্ষেপান হত। আলীর স্ত্রী আমাদের জেঠতুত ভাইকে ধর্মবাপ ডেকেছিলেন, আর সেই সূত্রে অভিধাটি আমার ওপর প্রযুক্ত হত। ওদের দুই পরিবারের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়ের মতো। আমি তখন পাঠশালাও শেষ করি নি, তবু আলীর স্ত্রী আমাকে বাবা বলে ডাকতেন। সেই কণ্ঠস্বর আজও শুনতে পাই। তাদের বাড়ি গেলে খুব যত্ন করে চা দিতেন। হালকা সবুজ রঙের ভারি কাপগুলো এখনো চোখে ভাসে। আমার কিশোরমন তাকে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি ভাবত। তার গৌর-ললাটে হয়ত ইরানী উদ্ভাস কাঁপত।

পাতান শ্বশুরকে সাহায্যের জন্য আলী তার ভিটেটি বিক্রি করেন। আজকের দিনে অবিশ্বাস্য হলেও সেকালে এ নিয়ে কোনো আলোড়ন ওঠে নি। দেশবিভাগের পর আমাদের জেঠতুত ভাই ভারতে চলে যান। নিঃসন্তান, ভিটেহীন আলী গ্রামান্তরী হন। আমি পড়াশোনার জন্য শহরে চলে যাই। বাড়িতে যাতায়াত কমে আসে। বহু বছর পর ষাটের দশকের মাঝামাঝি এক ছুটিতে দেশে ফিরে আলীদের দেখতে যাই। মাইল কয়েক দূরের এক গাঁয়ে তাঁরা থাকেন। শীতের দিন। শূন্য শুষ্ক মাঠ। পথেই সূর্যাস্ত হল। খোঁজাখুঁজির পর একটি কুঁড়ের সামনে এসে পৌঁছলাম। মাঠের মাঝখানে বেড়া দিয়ে ঘেরা এক চিলতে উঁচু জমি, কিছু বাঁশঝাড়। খোলা ফটকে দাঁড়ালাম। ধপধপে উঠোনে একটি ছাগল বাঁধা, পলোর নিচে কয়েকটি হাঁসমুরগি, বাঁশঝাড়ে নীড়েফেরা পাখির

কাকলি। মনে হল বাড়িতে কেউ নেই। হয়ত আলী বাজারে গেছেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অগত্যা ডাকলাম — 'বাড়ি আছেন?' ঘরের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এল 'কে'? কী বলব? কত বছর কেটে গেছে। পনেরো, বিশ। শেষে গাঁয়ের নামটা বললাম। বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া, মাথায় ঘোমটা, মলিন বিষণ্ন। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। মনে হল নিস্পন্দ হয়ে গেছেন। ঘোমটা খসে পড়ল। দেখলাম চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে। হঠাৎ আমার হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। তাঁর অস্ফুট বিলাপে যেন অন্ধকার গাঢ়তর হল, বাঁশঝাড়ে পাখপাখালিরা নিশ্চুপ হয়ে গেল। 'বাবা, আমার বাবা, আমরা কে কোথায় বাবা

জীবজগতের বিবর্তনের মতো মানব সমাজের বিবর্তনেও সংশ্লেষের প্রক্রিয়াটি পরিস্থিতি সাপেক্ষে কখনো দ্রুত, কখনো শ্লথ এবং সর্বত্রই অংশত অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়নির্ভর। সন্দেহ নেই, দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রকোপ ও দেশবিভাগের পরিস্থিতিগত বৈগুণ্যে হিন্দু-মুসলমানের পূর্ণাঙ্গ বাঙালি হয়ে ওঠার আনুষঙ্গিক ওই সঞ্চয় প্রক্রিয়াটিতে টান পড়েছিল, কিন্তু থেমে যায় নি। এমন অজস্র অসংখ্য প্রমাণ আমরা পেয়েছি একাত্তরের সংগ্রামের দিনগুলোতে। এখন এই সঞ্চয়প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রটিতে যখন আবার ঊষরতা বিরাজিত তখন হায়াৎ মামুদ শোনালেন 'আইস ভাগ্যের কাছে প্রণত হই। বাঙালি বলিয়া কোন লজ্জা নাই।' তার এই অভয়বাণী, আশার বাণী, আমাদের সম্পূর্ণ বাঙালি হয়ে ওঠার ঊষরতাবদ্ধ প্রকরণে উর্বরতা ছড়াক এবং লেখক সকল বাঙালির ধন্যবাদার্হ হউন।